গৈরিক পতাকা

গৈরিক পতাকা

দুর্গাপদ ঘোষ

—ঃ প্রকাশক ঃ—
প্রকাশন বিভাগ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
পশ্চিমবঙ্গ
৯/এ অভেদানন্দ সরণি
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রকাশকাল ঃ
শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য ঃ
দশ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
কেশব ভবন ঃ কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর কার্যপদ্ধতি এককথায় অভিনব। সঙ্ঘের প্রতিটি কার্যক্রম ও তার রূপায়ণের পদ্ধতি অনন্য স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সঙ্ঘ কোন ব্যক্তি বিশেষকে নয়, ভারতবর্ষের সনাতন 'ত্যাগ' আদর্শের প্রতীক গৈরিক পতাকাকেই গুরু রূপে বরণ করে নিয়েছে। গুরুরূপী এই গৈরিক পতাকাকে প্রণাম করেই সঙ্ঘের নিত্য শাখা শুরু এবং শেষ হয়। গুরু গৈরিক পতাকার কাছ থেকে দেশ ও জাতির জন্য যে সর্বস্ব সমর্পণের শিক্ষা গ্রহণ করে, 'রাষ্ট্র'কে পরমবৈভবশালী করার কাজে ব্রতী স্বয়ংসেবকদের সেটাই হয় প্রেরণার পাথেয়। একারণেই গৈরিক পতাকার বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা তাই একান্ত প্রয়োজন। 'গৈরিক পতাকা' বইটিতে লেখক দুর্গাপদ ঘোষ সেই প্রয়োজনটি পূরণেই সচেষ্ট হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘের অন্যতম প্রবীণ প্রচারক শ্রদ্ধেয় কেশবরাও দীক্ষিতের প্রেরণা, উৎসাহ এবং সর্বোপরি সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তিকাটির পরিবর্দ্ধন এবং পরিমার্জনেও তাঁর ভূমিকা আছে। পুস্তিকাটি পড়ে যদি লাভবান হ'ন তাহলেই এই প্রয়াস সার্থক হবে।

কিন্তু অনিবার্য কারণে নিতান্ত স্থানাভাব এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে পুস্তকটি প্রকাশ করতে হয়েছে তাতে অনবধানতা বশতঃ মুদ্রণ, তথ্য ও আলোচনাগত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আরও অনেক মূল্যবান তথ্য যে এর বাইরে থেকে গেছে একথা অনস্বীকার্য।

সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ, তেমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে প্রকাশকের ঠিকানায় লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়ে পরবর্ত্তী সংস্করণে তা বিচারযোগ্য তথ্য হিসাবে পর্যালোচনাভুক্ত হবে।

কলিকাতা — ইতি

শ্রীগুরুপূর্ণিমা, ১৪০৩ — **প্রকাশক**

প্রণমি তোমায় গৈরিকধ্বজ
পতাকা পুণ্যময়,
যুগযুগযামী তোমার বিভায়
বিশ্ব জ্যোতির্ময়।।

তোমার রশ্মিরাগে নিদ্রিত দেশ জাগে,
আঁধার ভেদিয়া দিগন্তে ঘটে—
নতুন অভ্যুদয়।।

তুমি শাশ্বত পবিত্র তুমি তুমি চির সনাতন,
সমুখ পথের রুদ্ধ দুয়ার করগো উদঘাটন।

তুমি চির স্মরণীয়
যুগযুগ বরণীয়
জাতির জীবনে ধ্রুবতারা তুমি অক্ষয় অব্যয়।।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় আমাদের এই পুণ্যভূমি ত্রিখণ্ডিত হয়েছে। খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণ দেশে প্রচলিত ভ্রান্ত রাজনীতি। দেশের সম্পর্কে অজ্ঞানতা মেকলে প্রবর্তিত কূটনীতির ফল। দেশের সঠিক পরিচয় না থাকার ফলে আমরা একটা নতুন জাতি তৈয়ারী করছি বলে আমাদের দেশের নেতাদের ধারণা ছিল। India a nation in the making — তারই পরিণতি। এই ভ্রান্ত চিন্তার ফলে আমাদের দেশের সমস্ত মানবিন্দুকে আমরা বিসর্জন দিয়ে নতুনের সন্ধানে চারিদিকে দেখতে আরম্ভ করলাম। প্রাচীন নাম ছেড়ে বিদেশীদের দেওয়া India কে বরণ করলাম। অতি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় বদলে উর্দু মিশ্রিত হিন্দুস্থানীকে গ্রহণ করলাম। তেমনি নতুন জাতির নতুন পতাকার সন্ধানে চিন্তা আরম্ভ করলাম।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার হেডগেওয়ার বিভ্রান্তি দুর করার জন্য এই দেশের প্রকৃত পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য হিন্দু সংগঠনের মধ্য দিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। দেশের প্রাচীন নাম সংস্কৃত ভাষার পুনর্প্রচলন এবং আমাদের জাতীয় চরিত্র তথা জীবনোদ্দেশ্য যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সেই সনাতন ধর্মের স্বর্ণগৈরিক পতাকাকে জগতের সামনে তুলে ধরলেন। আজ ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠেও সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রিতে যুবকদের সমাবেশে এই পতাকা সগৌরবে পতপত করে উড়ছে।

মর্যাদার প্রতীক

কোন পতাকাই কেবল এক খণ্ড রঙিন কাপড় মাত্র নয় — প্রতীক। আর জাতীয় পতাকার মর্যাদা বলা বাহুল্য তার থেকে আরও কিছু বেশি। এটি কোন দেশ বা জাতির কেবল লোক দেখানো প্রতীক খণ্ডই নয়, রাষ্ট্র বা জাতির গৌরবময় মর্যাদার পরিচায়ক। জাতীয় পতাকা হল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি তথা জাতির প্রাণময় জীবন-দর্শন যার মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয় জাতির সামগ্রিক রাষ্ট্র-চরিত্র। আর এই জন্যই জরতীয় পতাকার অপমান করা বা এর অপমান সহ্য করা সমান অপরাধজনক। এই কারণেই দেশের ভিতরে বা বাইরে জাতীয় পতাকার কোন অসম্মান, এমনকি তা উত্তোলনের সময় একটু এদিক ওদিক হলেও আমরা আহত হই, অপমানিত বোধ করি, প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠি। শাস্তি দাবি করি অপরাধীদের— সে স্বদেশী বা বিদেশী যেই হোক না কেন।

জাতীয় পতাকার মর্যাদা মস্পর্কে কতখানি অনুভূতিপ্রবণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্যারি সোবার্সের নেতৃত্বে ক্যারাবিয়ান ক্রিকেটাররা ভারতের সঙ্গে টেষ্টম্যাচ খেলতে এসেছিলেন। কলকাতার রণ্‌জি স্টেডিয়ামে ভারত-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্টের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়ে যায়। পুলিশ লাঠি চার্জ করে। প্রচণ্ড হুড়োহুড়ির মধ্যে মাঠের এককোণে আগুন ধরে যায়। সেখানেই যুগপৎ উড়ছিল ভারত ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ উভয় দেশের জাতীয় পতাকা। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রচণ্ড ত্রাসে চারিদিকে ছুটোছুটি লুটোপটির মধ্যে দেখা গেল ওই ভয়ঙ্কর আগুনের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সেবারের সহ-অধিনায়ক কনারড হাণ্ট এবং পতনোন্মুখ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়ে প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে বেরিয়ে এলেন! জাতীয় পতাকার মর্যাদা যে জীবনের চেয়েও বড় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখলেন হাণ্ট।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা কি হওয়া উচিত তার প্রস্তাবে ভগিনী নিবেদিতা বার বার যেন ঠিক এক ধরণের গৌরবানুভূতিরই পুনর্মূলযায়ণ করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন ভারত ইংরেজের শাসনমুক্ত হলেও তার প্রকৃত জাতীয় সম্পদকে যদি ফিরিয়ে না আনা হয়, তবে জাতি হিসাবে রাজনৈতিক দিকে স্বাধীন

হলেও ভারতীয়রা তাদের আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পাবে না। কারণ, কেবল আইনগত নাগরিকত্ব মানেই জাতীয়তা নয়। শুধু 'নাগরিক' মানেই জাতির জীবন-শরিক নয়। 'জাতি' মানে একটি অখণ্ড সমাজের পরম্পরাগত সংস্কৃতির ধারাবাহিক প্রবহমানতাও বটে। রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে নিজস্ব সরকার পরিচালিত জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা বা সার্বভৌমিকতাকেই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টট্ল প্রধান উপাদান বলে অভিহিত করলেও কোন জাতির ক্ষেত্রে তার সাংস্কৃতিক পরম্পরাও যে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা Political Unit বলা গেলেও জাতি কিন্তু একটি সাংস্কৃতিক ধারণা বা Cultural Concept-এরই দ্যোতক। আর এই বোধ বা প্রতীতির ভিত্তিতেই গৈরিক পতাকাই ভারতবর্ষের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ধারা অনুসারী জাতীয় পতাকা হবার দাবি রাখে— এই ধারণা ও বিশ্বাস বহু লোকের, বহু মনের গভীরে প্রোথিত। এমনকি জাতীয় কংগ্রেসের 'ফ্ল্যাগ কমিটি'ও একথা স্বীকার করেছিলেন।

কোন মানুষের আত্মবোধ ঘটে যেমন তার নিজের জীবনের স্মৃতি ও অনুসঙ্গের মধ্যে, তেমনি কোন জাতির জাতীয় চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে তার সাংস্কৃতিক পরম্পরার ঐতিহাসিক সত্যের মধ্য দিয়ে, আর সেই পরম্পরাগত ইতিহাসবোধের ধারক ও বাহক হল তার জাতীয় পতাকা।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় পতাকার যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি করে নানা পর্যায়ে নানা প্রকার জাতীয় পতাকার প্রস্তাব উঠেছে এবং সে সবের রূপ ও রং ছাড়াও তার দর্শনতত্ত্ব নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু খুবই দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয়, সেখানে ভগিনী নিবেদিতা প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকার উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে।

ধারাবাহিকভাবে জাতীয় পতাকা তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয় বঙ্গভঙ্গের সময়, ১৯০৫ সালে। কিন্তু তারও আগে এদেশে প্রথম জাতীয় পতাকা হিসাবে যেটি ১৮৮৩ সালে লাহোরের রাস্তায় বহন করা হয়েছিল তার রং রূপ সঠিকভাবে জানা যায় নি। তারপর থেকে সময়ে অনেক পতাকারই আবির্ভাব ঘটেছে যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত এবং ফরাসী বিপ্লবী পতাকার অনুসারী। বেশ কয়েকটিতে ছিল প্রাচীন ভারতীয় পবিত্রতার প্রতীক পদ্মফুল আঁকা, কোন কোনটিতে ছিল সূর্য অথবা চন্দ্রতারা।

---

* কমিটির পুরো রিপোর্ট শেষের দিকে প্রদত্ত হল।

১৯০৫ সালে যখন প্রথম প্রচেষ্টা হয় তখন বারাণসীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা তখন বারাণসীতেই থাকতেন। তাঁর নিবাসে একত্রিত হতেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। নিবেদিতার কাছে তাঁরা যখন ভারতের জাতীয় পতাকা কি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত চান তখন নিবেদিতা যে পতাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা ছিল পূর্ণ গৈরিক। সেই চৌকো গৈরিক পতাকার মাঝখানে ছিল একটি বজ্রচিহ্ন এবং দেবনাগরীতে লেখা 'বন্দেমাতরম্'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার পরের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণবশতঃ সেটি আর স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নি।

ওই পতাকাটির আগে নিবেদিতা যে পতাকা তৈরি করেন এবং ১৯০৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী রাজনৈতিক মহলে দেখান সেটি ছিল লাল এবং তার উপরে কালো রঙের নক্সা আঁকা। কিন্তু ভারতীয় আদর্শ ও পরম্পরার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকায় তা গ্রহণযোগ্য হয় নি। এ সম্পর্কে নিবেদিতা নিজেই বলেছেন, "আমরা জাতীয় পতাকার ডিজ্বাইন নির্বাচন করছি— বজ্র— এবং তা দিয়ে ইতিমধ্যে পতাকাও তৈরি করেছি। দুঃখের বিষয়, আমি চীনা যুদ্ধ পতাকাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম— রক্তপ্রচ্ছদের উপরে কৃষ্ণবর্ণ নক্সা। কিন্তু ভারতের মনে এটা সাড়া জাগায়নি"। পরে তিনি গৈরিক পতাকাটি তৈরি করান তাঁর ছাত্রীদের দিয়ে। জাতীয় প্রতীক হিসাবে 'বজ্র' তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছিল ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সময়। সঙ্গে ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার। ওখানে বজ্রচিহ্ন দেখে নিবেদিতা লোকরক্ষায় দধিচীর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বজ্রকে ভারতের জাতীয় প্রতীক করতে আগ্রহী হন। এ সম্পর্কে মিস ম্যাকলাউডকে ১৯০৪ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি একটি চিঠিও লেখেন।

১৯০৯ সালে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় ছদ্মনামে লেখা নিবেদিতার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'দি বজ্র অ্যাজ এ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ' শিরোনামের সেই লেখা থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে ইউনিয়ন জ্যাকের প্রতি তাঁর সামান্য দুর্বলতার ভাব থাকলেও পরে তিনি পুরোপুরিভাবেই অনুভব করেন যে ভারতের প্রানোৎসারিত জাতীয় পতাকা হওয়া উচিৎ পূর্ণ গৈরিক আর তার মধ্যে থাকা উচিত সমাজ-জাতি-ধর্ম রক্ষায় আত্মত্যাগী দধিচী'র অস্থি নির্মিত বৃত্রাসুররূপী সর্বরিপু সংহারক বজ্র চিহ্ন।

ওই প্রবন্ধে নিবেদিতা তাঁর প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তা কেবল রূপ-রীতিতেই অনবদ্য ছিল তাই নয়, তার দার্শনিক ব্যাখ্যাও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিবেদিতার নিজের কথায়, "জাতীয় পতাকাকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; তা কেবল একটি জাতির প্রাণ ও ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হতে পারে।" তাঁর ভাষায়, "পতাকা আশীর্ব্বাদ ও উৎসর্গের আহ্বান নিয়ে জন্মলাভ করবে জাতির আত্মলোকে।"

নিবেদিতা প্রস্তাবিত ওই পতাকার পর ১৯০৬ সালের ৭ আগষ্ট 'বয়কট দিবসে' কলকাতার পার্শীবাগানে (গ্রীয়ার পার্ক) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং তা অনুমোদন করেন নরেন্দ্রনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আবদুল হালিম গজনবী প্রমুখ মডারেট নেতারা। পতাকাটি ছিল সমান্তরালভাবে উপর থেকে নিচের দিকে পর্যায়ক্রমে গাঢ় সবুজ, গাঢ় হলুদ এবং গাঢ় লাল। উপরের সবুজ অংশে ছিল শ্বেত পদ্ম, হলুদ অংশে নীলবর্ণে দেবনাগরীতে লেখা 'বন্দেমাতরম' আর নিচের লাল অংশের বাঁদিকে সাদা রঙের সূর্য আর ডানদিকে সাদা রঙের অর্ধচন্দ্র ও তারা। পতাকাটির পরিকল্পনাকারীর নাম সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান, এর রূপকার ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো)।

পরের প্রচেষ্টা হয় বিপ্লবীদের দ্বারা। প্যারিসে নির্বাচিত মাদাম কামা ১৯০৭ সালে জার্মানীর স্টুটগার্ডে দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিকদের সপ্তম অধিবেশনে ভারতের জন্য যে প্রস্তাবিত পতাকা রাখেন সেটিও ছিল তিন রঙা। তবে তাতে গেরুয়ার স্থান ছিল না। বস্তুতঃ কামা সরাসরি ইতালির জাতীয় পতাকার সঙ্গে আমেরিকার পতাকার কিছু সমন্বয় করে ওই পতাকা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ইতালির পতাকার রং লাল, সাদা ও সবুজ। এটির প্রচলন হয় ম্যার্জিনীর সময়। মাদাম কামা ওই পতাকার উপর আমেরিকার পতাকায় যেমন সেদেশের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি করে নেভি ব্লু রঙের মোট ৫০টি তারকা চিহ্ন আছে, ভারতের পতাকার জন্যও তেমনি ছোট ছোট ৭টি তারকা ও একটি পদ্মফুল অঙ্কিত করেন। পতাকাটি ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় প্রদর্শনের সময় সেখানে স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরও উপস্থিত ছিলেন।

এরপর ১৯১৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর অ্যানি বেসান্ত 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং.১৯১৭ সালে কংগ্রেসের পতাকার পরিবর্তন ঘটিয়ে করেন হোমরুল পতাকা। সেটি ছিল সমান্তরালভাবে পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ রেখা সম্বলিত এবং তার উপরের এক চতুর্থাংশ জুড়ে ছিল ইউনিয়ন জ্যাকের ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো একটি রেপ্লিকা। অবশ্য ওই পতাকাও বাতিল হয়ে যায়।

১৯২০ সালে ফের নতুন করে জাতীয় পতাকার কথা চিন্তা করা হয় কংগ্রেসী আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য। বিজয়ওয়াড়া কংগ্রেস অধিবেশনে সেটি আত্মপ্রকাশ করে। তখন মাদাম কামা প্রস্তাবিত তেরঙা পতাকাটিকেই একটু হেরফের করে পদ্মফুলের বদলে মাঝখানে রাখা হয় একটি চরকা। এবার রঙেরও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বলা হয় সবুজ মুসলিমদের জন্য, সাদা খৃষ্টান আর লাল রং হিন্দুদের জন্য। গান্ধীজী প্রস্তাবিত ওই পতাকা জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সামনে রাখা হয় ১৯২১ সালে। সবার উপরে রাখা হয় সাদা, মাঝে সবুজ আর সবার নিচে লাল। গৈরিক তো স্থানই পেল না, তার উপর এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য যে লাল রঙের কথা বলা হল তাকেও রাখা হল সবার নিচে। পতাকাটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন না পাওয়া সত্বেও বিভিন্ন কংগ্রেস সম্মেলনে কিন্তু উত্তোলিত হতে থাকে।

ফ্ল্যাগ কমিটির সিদ্ধান্ত

প্রায় এক দশক ধরে এই অবস্থা চলার পর ১৯৩১ সালে করাচীতে বসে কংগ্রেসের জাতীয় কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। সেখানে জাতীয় পতাকা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য কংগ্রেসের ৭ জন বিশিষ্ট সদস্যকে নিয়ে 'ফ্ল্যাগ কমিটি' নামে একটি সমিতি গঠন করে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁদের সুপারিশ বা প্রস্তাব পেশ করতে বলে। জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত ওই প্রার্থী 'ফ্ল্যাগ কমিটি'র আহ্বায়ক ছিলেন ডঃ পট্টভি সীতারামইয়া। অন্যান্য সদস্যরা হলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, র্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, অধ্যক্ষ ডি পি কালেলকর, ডঃ এন এস হার্ডিকর এবং মাষ্টার তারা সিং।*

খুব অল্প দিনের মধ্যেই ওই পতাকা সমিতি কিছু প্রশ্নমালা তৈরি করে সকলের মতামতের জন্য পাঠালেন, বিভিন্ন প্রাদেশিক সমিতিকে চিঠি লিখে আমন্ত্রন জানানো হল; কেন্দ্রিয় কার্য্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে আমন্ত্রন জানানো হল

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের। অন্ধ্র, বিহার, বোম্বাই নগর, কর্ণাটক, সিন্ধু, তামিলনাড়ু, ওড়িশা এবং উত্তরপ্রদেশ এই ৮টি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, ৫০ জন বিশিষ্ট নেতা এবং কেন্দ্রীয় শিখ লীগ লিখিতভাবে নিজ নিজ মতামত পাঠালেন। মতামত জানানোর শেষ দিন ১জনু ধার্য হলেও ৬ জুলাই পর্যন্ত গৃহীত হয়।

সেই বছরই (১৯৩১) ৭ জুলাই থেকে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠক চলাকালেই ৮ ও ৯ জুলাই 'ফ্ল্যাগ কমিটি'র জন্য দুটি বৈঠকের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রথম দিনের বৈঠকে সমস্ত সদস্য উপস্থিত থাকলেও ৯ তারিখের বৈঠকে আজাদ অনুপস্থিত হন।

ফ্ল্যাগ কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে জাতীয় পতাকার রঙের মধ্যে কোন রকম সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন থাকা উচিত নয়। সুতরাং সমিতির সামনে তার রং ও রূপ নির্ণয়ে একটি কঠিন প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। বহু আলোচনা ও লিখিত মতামত গ্রহণের পর কংগ্রেস সভাপতির কাছে তাঁদের লিখিত প্রতিবেদনে পূর্ণ গৈরিক পতাকাই ভারতের জাতীয় পতাকা হওয়া উচিত বলে প্রস্তাব দিয়ে বলা হয়, **"সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবে ঠিক হয়েছে যে ভারতের জাতীয় পতাকা হবে এক রং বিশিষ্ট এবং তার উপরে একাধিক রঙের একটি চিহ্ন থাকবে যদি কোন একটি রং সমস্ত ভারতবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, যা সর্বোপরি ভিন্ন, স্পষ্ট এবং এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গের পরম্পরাগতভাবে সম্পর্কিত, তবে তা হল গৈরিক।"** *"If there is one colour that is more acceptable to the Indians as a whole, even as it is more distinctive than another, one is associated with this ancient country by long tradition, it is the Kesari or saffron colour."* সুতরাং ফ্ল্যাগ কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ভারতের জাতীয় পতাকা হবে পূর্ণ গৈরিক রঙের এবং তার মধ্যে প্রতীক চিহ্ন থাকবে, অন্য রঙের একটি চরকা।

আলোচনার সময় হল, পদ্মফুল, প্রভৃতি প্রতীক সম্পর্কেও মতামত আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরকাই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। কারণ সমিতির মতে চরকাই সেই প্রতীক যাকে কেন্দ্র করে গত দশ বছর ধরে জাতীয় আন্দোলন বিকাশ লাভ করেছিল। সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে চরকার রং নীল হবে বলেও স্থির হয়। ঠিক হয় চরকাটি থাকবে পতাকার বাঁ পাশের এক চতুর্থাংশে লম্বালম্বিভাবে।

কংগ্রেসের তৎকালীন তেরঙা পতাকার সম্পর্কেও সমিতি বিস্তর চিন্তা ভাবনা করে এবং তার প্রতি সহানুভূতি রেখে বলা হয় যে, "এই পতাকাকে সামনে রেখেই একদিন অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল, এই পতাকা নিয়েই হাজার হাজার মানুষ নাগপুরের জেলে ঢুকেছিলেন। কিন্তু যুক্তিগুলি অকাট্য হলেও একথা মনে রাখা দরকার যে বিগত দশ বছর ধরেএই পতাকার প্রতি যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছে তা কোন রং বিশেষ বা কোন বিশেষ প্রতীককে কেন্দ্র করে নয়। তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ তথা স্বাধীনতার জন্য জাতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতা। বহু ঝড়, ঝঞ্ঝা ও প্রখর রৌদ্রপতাপের মধ্যেও কোন জাতির কাছে তার জাতীয় পতাকা হল অনন্ত প্রেরণার উৎস। এক্ষেত্রে তার কি রং বা কি তার আকৃতি সেটা কোন বড় ব্যাপার নয়।"

নতুন পতাকার সঙ্গে অতীত ত্যাগের সম্পর্ক নেই

কমিটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, "এই পতাকাকে এখন নতুন প্রতীকে পরিবর্তিত করার কথা চিন্তা করা এক দুরূহ কাজ। কারণ, আমাদের অতীত ত্যাগ ও গৌরবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই।" কমিটি এমন চিন্তা করলেন যে, ওই পতাকা থেকে চরকাটি সরিয়ে দিলে তা বুলগেরিয়ার জাতীয় পতাকার মত। এই সমস্ত বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন পরম্পরার সঙ্গে একাত্মভূত প্রতীক হিসাবেই গৈরিক পতাকাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় এবং কমিটি সেই সিদ্ধান্তই তাঁদের রিপোর্টে তুলে ধরেন।

গৈরিকের প্রতি শিখদের আগ্রহ

বলা নিষ্প্রয়োজন কংগ্রেসের "ফ্ল্যাগ কমিটি" প্রস্তাবিত গৈরিক পতাকা সম্পর্কে শিখরা কোন আপত্তি তো তোলেইনি, বরং তৎকালীন তেরঙা পতাকার রঙের সম্পর্কে প্রথম থেকেই তাঁরা আপত্তি করতে শুরু করেন। ১৯২৯ সালে শিখ প্রতিনিধিরা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখাও করেন। শিখরা গৈরিকই যাতে জাতীয় পতাকায় থাকে সেজন্য চাপও সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ তাঁরাও গৈরিকের পূজারী। দশম গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মদিনে নিয়মিতভাবেই গুরুদ্বার গুলিতে গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করা হয়ে থাকে। বৌদ্ধদেরও আপত্তির কারণ ঘটেনি। স্বয়ং বুদ্ধদেব ছিলেন গৈরিক ধারী সন্ন্যাসী। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরাও গেরুয়া পরিধান করে থাকেন।

মুসলিমদেরও আপত্তির কারণ ছিল না

এত সব সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেসের নিজেদেরই মনোনীত কমিটির সর্বসম্মত প্রস্তাবটি কেন যে গৃহিত ও কার্যকরী হল না সেটাই রহস্য। আসলে কংগ্রেসে তখন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের চাইতে তথাকথিত 'সেকুলার' বা অতি সেকুলার তথা সংখ্যালঘু তোষামুদেদের রমরমা ছিল বেশি। সুতরাং নেহরুর চাইতেও তখনকার কিছু বেশি সেকুলার কংগ্রেসী হয়ত ভেবে থাকবেন যে, মুসলিমরা 'হিন্দু' পতাকাকে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে নাও মেনে নিতে পারেন। তাছাড়া যতদূর জানা যায় গান্ধীজীর মত ছিল না গৈরিক পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকা হোক। হিন্দু মুসলিম মিলনের পথে মুসলিমদের 'না-পসন্দ্' কোন কিছুই যে তাঁর পছন্দ ছিল না। অথচ বলা বাহুল্য ঠিকমত ব্যাখ্যা সহকারে এবং ইতিহাসের নিরিখে সঠিকভাবে প্রচার করা হলে গৈরিক পতাকা সম্পর্কে মুসলিমদের আপত্তি থাকার কোন কারণই ছিল না। কেননা, শোনা যায় পয়গম্বর হজরত মহম্মদ নিজেও একটা যুদ্ধে গৈরিক পতাকা বহন করেছিলেন এবং Opnstituent Assembly তে পতাকা সম্পর্কে আলোচনা চলাকালীন এক মুস্লিম সদস্য শ্রী সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা বলেছিলেন ঃ

"গৈরিক পৃথিবীর অবস্থার কথা বর্ণনা করে যে দগ্ধ অবস্থা ভারতীয় সূর্যের অতীব উষ্ণ দ্বারা ঘটিত। গেরুয়া সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সুবিদিতরঙ যারা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করেন, এবং যাদের অবস্থান কেবল হিন্দুদের মধ্যে নয়, মুসলমানদের মধ্যেও আছে তাই গৈরিক আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য যা সাধু সন্ত পণ্ডিতগণের বাসভূমি।

কিন্তু যেখানে কংগ্রেসের হিন্দু নেতারাই এগোলেন না সেখানে সামান্য দু'চার জনের চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

ডাঃ হেডগেওয়ারের প্রচেষ্টা

১৯৩১ সালের ১ আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলে ফ্ল্যাগ কমিটির ওই রিপোর্ট তুলে ধরা হয়। ওই অধিবেশনে যোগ দেবার আগে আর. এস. এসের প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাক্তন কংগ্রেসী ও তিলকপন্থী বিপ্লবী ডাঃ হেডগেওয়ার ডঃ আণেকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন জাতীয় পতাকার প্রশ্নে ভারতের

সনাতন গৈরিক পতাকার পক্ষেই যুক্তি ও মত প্রকাশ করেন। এমনকি এজন্য ডাঃ হেডগেওয়ার নিজে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আর. এস. এস. প্রতিষ্ঠার যুক্তি ছিল, দল আসে, যায়, ভাঙ্গে, গড়ে। কিন্তু জাতি বা রাষ্ট্র চিরন্তন পরম্পরার ধারক ও বাহক। অতএব, দলীয় পতাকা সতত পরিবর্তনযোগ্য হলেও জাতীয় পতাকা চিরন্তন সংস্কৃতির প্রতীক। সুমহান ত্যাগই হল ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির চিরন্তন পরম্পরা। সত্য, ন্যায় ও তেজই এর আধার। সুতরাং ভারতের জাতীয় পতাকা গৈরিক ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

গৈরিকের প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় নি

সেই অধিবেশনে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিস্তর আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হল। কিন্তু লোকমান্য তিলকের লোকান্তরের পর কংগ্রেস মানেই যেন গান্ধীজী, গান্ধীজীই যেন কংগ্রেস। তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছাই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। ফলে যা অনুমান করা হয়েছিল তাই-ই হল। কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের তেরঙা ঝাণ্ডা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। কম্বল মোড়া হয়ে চাপা পড়ে গেল ফ্ল্যাগ কমিটির প্রস্তাব। তবে গৈরিকের। সম্পর্কে যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয় এবং শিখ সমাজের দিক থেকে যে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে এবার আর গৈরিককে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি তাই নয়, তাকে সবার উপরের স্থানেও বসানো হয়। গৈরিক অথবা কেসরিয়া রঙ্গের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণান্ এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী। সংবিধান সভাতে এই বিষয়ে ভাষণ দিতে ডাঃ রাধাকৃষ্ণান্ বলেছেন—

"লাল, কমলা এবং ভগোয়া রঙগুলি আত্মত্যাগের চেতনার কথা বর্ণনা করে। এইরকম বলা হয়েছে— 'সর্বে ত্যাগে রাজ ধর্মেষু দৃষ্টাঃ' অর্থাৎ দার্শনিকগণই রাজা হবেন, আমাদের নেতৃবৃন্দ অবশ্যই স্বার্থত্যাগী হবেন, তাদের আত্মা অবশ্যই উৎসর্গিত হবে। তাঁরা সেই সব ব্যক্তি যাঁরা আত্মত্যাগের চেতনায় রঞ্জিত, যে চেতনা ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকেই আমাদের নির্দিষ্ট পথে প্রেরিত করেছে।

ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী ১৯৩১ সালে তাঁর লেখাতে বলেছেন, 'বৈরাগ্য ও অহিংসার দ্বারা প্রকাশিত আত্মত্যাগ ও প্রতিহীনতার আদর্শের দ্বারা ভারতীয়দের জীবনযাত্রা প্রেরিত, রাজন্যবর্গ বৃদ্ধ বয়সে হিন্দু ভারতে বনে গিয়ে আশ্রমবাসী হওয়ার প্রেরণা লাভ করেছেন। আত্মত্যাগের ঐ একই আদর্শবাদ রাজকুমার সিদ্ধার্থকে

গৈরিক বসনাবৃত বুদ্ধদেবে পরিণত করেছে। গৈরিক, রক্ত অথবা ভগোয়া বস্ত্রধারী ভারতীয় সন্ন্যাসীগণ আমাদের মনকে বলপূর্বক ক্ষতিশূণ্যতা ও নির্লিপ্ততার আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করে। এই গৈরিক রঙ দার্শনিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পরম্পরার প্রতীক। কারণ এই রঙ ব্রহ্মচারিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। এই রঙের সংশোধন করে তৈরী হয়েছে হলুদ, বাদামী অথবা বৌদ্ধদের কাষায় যা হল, বৌদ্ধদের ভ্রাতৃত্বের এবং অহিংসার এক বাস্তব মহান প্রতীক। পৃথিবীর রঙ হল একধরণের খাঁকী। মাতা পৃথিবীর প্রদোষকালীন অবদান হল রক্তবর্ণ। এই রক্তিম বাদামী এবং সাদা রঙ ভারতীয় মুসলমানগণ গ্রহণ করেছে ভ্রাতৃপ্রতিম হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতই।

সংবিধান সভার একজন সদস্য শ্রী খাণ্ডেকর তাঁর ভাষণে বলেছেন — 'যখন শিবাজী ক্ষমতাসীন ছিলেন এবং এই দেশকে মুক্ত করে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করার সুযোগ পেয়েছিলেন তখন এই গৈরিক পতাকার তলে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আত্মত্যাগ করেছিলেন। কোরগাঁও এর সিদ্ধনাথ মাহের লৌহস্তম্ভ আজকেও সেই যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' শুধু তাই নয়; নতুন করে রঙের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়, উপরের গেরুয়া হল ত্যাগ ও সাহস, মাঝের সাদা হল সত্য ও শান্তি আর নিচের সবুজ হল বিশ্বাস ও শৌর্যের প্রতীক। সাদার মধ্যে নীল রঙের চরকাকে বলা হল ভারতীয় জনগণের আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক। গৈরিকের ব্যাখ্যা যদি এটাই হয় তাহলে তা কেবল 'হিন্দু' প্রতীক হয় কি করে বোঝা দুর্বোধ্য। বলা বাহুল্য এটিই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের দলীয় পতাকা থেকে গেছে। অনেকের ধারণা কংগ্রেস তার দলীয় পতাকাকেই ভারতের জাতীয় পতাকা করতে চেয়েছিল যাতে দলের মর্যাদা আরও বেশি করে বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় দল বলতে কেবল কংগ্রেসকেই বোঝায়। সম্ভবতঃ এই কারণেই গৈরিকের প্রস্তাব এবং তার পক্ষে অকাট্য যুক্তি ও ভারতীয় ঐতিহাসিক পরম্পরা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস তাকে কার্যকরী করেনি। এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের চাইতে কংগ্রেস তার দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখেছিল বলেও সন্দেহ করেন কেউ কেউ।

ডঃ আম্বেদকরের প্রচেষ্টা

এখানেই শেষ নয়। জাতীয় পতাকা নিয়ে ফের প্রশ্ন ও আলোচনার সূত্রপাত হল ১৯৪৭ সালে সংবিধান পরিষদে। ভারতীয় সংবিধান রচয়িতা দলের নেতা

তথা ভারতীয় সংবিধানের জনক বলে কথিত বাবাসাহেব আম্বেদকর গোড়া থেকেই চেষ্টা করে গেলেন যাতে গৈরিককেই জাতীয় পতাকা করানো হয় কিন্তু সেখানেও কোন কিছু করা গেল না। এমনকি চরকার বদলে ধর্মচক্র আনতে কম কষ্ট করতে হল না তাঁকে। কারণ গান্ধীজী চরকা সম্পর্কে ছিলেন প্রায় নাছোড়বান্দা।

সংবিধান পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবার আগে বোম্বাই থেকে দিল্লী রওনা হবার সময় বোম্বাই বিমান বন্দরে বেশ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতা উপস্থিত থেকে ডঃ আম্বেদকরকে গৈরিক পতাকার উপর জোর দেবার জন্য শেষবার অনুরোধ করলে সেখানে তিনি পরিস্কার করেই বলেছিলেন যে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলেন যে কংগ্রেসের ভোটের জোর বেশি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ নিয়ে একটি ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংগঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ কিছু করা যাবে বলে তাঁর মনে হয় না। কিন্তু তখন একে তো সময়ের বড় অভাব, তার উপর এতদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর নতুন আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে ব্যাপক হিন্দু নিধন ও বিপুল পরিমাণে শরণার্থী আগমন নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতাদের।

অশোকচক্র

শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই গান্ধী-নেহরু মানসিকতাবাদীদের সমর্থনের জোরে ১৯৩১ সালের প্রস্তাবিত তেরঙা পতাকাই গৃহীত হল। তবে ডঃ আম্বেদকরের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেসের চরকার বদলে এল অশোকের ধর্মচক্র। তিনি যখন দেখলেন গেরুয়াকে কোনভাবেই ভারতের জাতীয় পতাকা করা গেল না তখন ধর্মের দেশের প্রতীক হিসাবে যাতে সত্যেরই জয় হয় সেজন্য চরকার জায়গায় অশোক চক্রের প্রস্তাব করলেন এবং তার পক্ষে তুলে ধরলেন জোরালো এবং অকাট্য যুক্তি এবং শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণ করিয়ে ছাড়লেন। গান্ধীজী এতেও রাজী হচ্ছিলেন না। পণ্ডিত নেহরু তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে চক্রটি আসলে চরকারই চাকা এবং যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত নেহরুর কথা মেনে নেন। বলা বাহুল্য এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে মহামতি অশোক প্রতিষ্ঠিত মহান ধর্মের পরিবর্তনশীল চক্রকে শেষ পর্যন্ত চরকার চাকা বলে চালাতে হল। এই ব্যাখ্যা অনুসারে তো কোন শকটের চাকাকেই চক্র বলা যেতে পারে। যাই হোক

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট লালকেল্লায় চক্র শোভিত তেরঙা পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়। বলা হয় এটি ভারতবাসীর প্রগতির প্রতীক।

এই জাতীয় পতাকা নির্ধারিত হয়ে যাবার পরও ঠিক হল ভারতের প্রদেশগুলির রাজ্যপালরা জাতীয় পতাকার পাশাপাশি ব্যবহার করবেন অশোকস্তম্ভ ও 'সত্যমেব জয়তে' লেখা গেরুয়া পতাকা। আর তাতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নিজ নিজ প্রদেশের নামাঙ্কিত থাকবে অশোকস্তম্ভের নিচে। অর্থাৎ ফ্ল্যাগ কমিটির প্রস্তাব তথা নিজ প্রদেশ নামাঙ্কিত থাকবে অশোক স্তম্ভের নিচে। অর্থাৎ ফ্ল্যাগ কমিটির প্রস্তাব তথা সুপারিশ বাতিল হয়ে গেলেও গৈরিক পতাকার স্থানকে কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব হল না। কোন না কোনভাবে তাকে সম্মান জানানো হল। প্রচ্ছন্নভাবে হলেও স্বীকার করে নেওয়া হল গৈরিক পতাকাই ভারতবর্ষের সনাতন পরম্পরার জাতীয় প্রতীক।

জাতীয় সম্পদ ফিরিয়ে আনা হল না

দুঃখের বিষয় এতখানি এগিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রকৃত জাতীয় সম্পদকে সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বমর্যাদায় ফিরিয়ে আনা হল না, বসানো হল না সঠিক আসনে, গুরুত্ব দেওয়া হল না জাতীয় ভাবকে। জাতীয়ভাব মানে 'কোন জাতির মানুষের কাছে সেই জাতির সম্পদকে ফিরিয়ে আনা'। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না জনগণ নিজের দেশকে সামগ্রিকরূপে দেখতে পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা কদাপি ঘটতে পারে না। ভগিনী নিবেদিতার এই কথাগুলি অনুসরণ করে অগ্রসর হলে জাতীয় সম্পদকে ফিরিয়ে আনা বা নিজের দেশকে সামগ্রিকরূপে দেখার ভাব স্বাধীনোত্তর ভারতে যে কতখানি বিঘ্নিত হয়েছে আমাদের বর্তমান জাতীয় মানসিকতার দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারা যায়।

আমরা ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক তথা ভারতীয় জাতিসত্তার অংশ। সুতরাং স্বীকৃত জাতীয় পতাকার রং ও রূপ যাই হোক না কেন তাকে সম্মান ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানানো আমাদের একান্ত অনিবার্য রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। এটা নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নিদর্শনও বটে। কিন্তু সেকথা স্বীকার ও স্মরণে রেখেও বলা যায় বর্তমান তেরঙা জাতীয় পতাকার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন পতাকা পরম্পরার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সম্পর্ক নেই। অথচ সেটিই ছিল অনিবার্য ও একান্ত অভিপ্রেত।

গৈরিক সমগ্র মানব সভ্যতার প্রতীক

বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতীকরূপে গৈরিক পতাকাই ভারতে পরম্পরাগতভাবে মর্যাদার আসন লাভ করে এসেছে। জাতীয় পতাকা বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় ভারতের ক্ষেত্রে সেটি হিন্দুত্বের দ্যোতক। কারণ মানব-ইতিহাসে প্রথম বিশ্বচেতনার যে উন্মেষ ঘটেছে এদেশে তা বিকশিত হয়েছে বৈদিক সভ্যতায় যার কালক্রমী রূপান্তর হল হিন্দুত্ব। সাধনপীঠ সদৃশ এই দেশে জাতীয়ভাবও বিশ্বজননীনতা পূর্ণতাবোধের প্রতিরূপ যার মূলমন্ত্র হল 'স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্'। সূর্যের নিচে ভারতই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশ তমসা বিনাশী প্রথম সূর্য কিরণের সুবর্ণ-গৈরিকচ্ছটা যার জাতীয় প্রতীকের রং। ত্যাগ ও সর্বমত সহিষ্ণুতা যার দার্শনিক বিভূতি। সেদিক থেকে বিচার করলে গৈরিক কেবল ভারতীয়ই নয়, সমগ্র মানব সভ্যতারও প্রতীক যার আদর্শ হল, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'— অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে চেতনার আলোকে উত্তরণ, ভয় হতে অভয় মাঝে নতুন জীবনের প্রকাশ।

পৃথিবীতে এক এক রাষ্ট্রজীবন এক এক ধারণা ও ইতিহাসের উপর আধারিত। ইসলামী সমাজ জীবনের মত কিছু রাষ্ট্রজীবনের মূল ভিত্তি ছিল সামরিক তথা বিজয় অভিযানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা। খৃষ্টান রাষ্ট্রজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্যের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে অন্যদের খৃষ্টত্বে ধর্মান্তকরণ কিম্বা ধর্মান্তরিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। কারণ এইসব 'সেমিটিক' ধর্মীয় সমাজ তাদের একক গ্রন্থ ভিত্তিক ধর্ম ধারণার বাইরে সামগ্রিকভাবে মনুষ্য সমাজের কথা ভাবতে পারত না বা এখনও পারে না। এদের কাছে এদের কেতাবী ধর্মচেতনার বাইরের সকলেই হয় 'আত্মবিশ্বাসী' নয়ত 'পাপী'। তাই তাদের উদ্ধারে রাষ্ট্র দখলের প্রয়োজনীয়তা এদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় হিন্দু জীবন যেসব তত্ত্বনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রতিভাত হয়েছে তা হল, মানুষের জীবন পবিত্র, ত্যাগময়, বৈরাগ্য সাধন সম্পন্ন, স্বাধীন, তেজস্বী ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ হোক। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাত্মতা হিন্দুদের কাছে কোনদিনও তাই কোন চাপিয়ে দেবার বিষয় হয়ে ওঠেনি। এটি ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের অন্তরানুভূতির সনাতন উপলব্ধি।

এজন্য ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজে রাষ্ট্র সমাজকে প্রভাবিত করলেও ভারতে যুগে যুগে সমাজই প্রভাবিত করে আসছে রাষ্ট্রকে। ফলে এদেশে কোনদিন কোন সর্বগ্রাসী রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন ইংরেজের শাসনমুক্ত হয় তখনও এখানে ৬৪৮টি দেশীয় খণ্ডরাজ্য ছিল, কিন্তু কোনটাই মূল

ভারতীয়ত্ব থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন বা পৃথক ছিল না তেমনি সর্বগ্রাসী মনোভাবও ছিল না কারো মধ্যে। গোটা ভারতবর্ষও কখনও সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের রূপ নেয় নি।

এ দেশের সর্বত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীরা গৈরিক ধ্বজা কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন, যেমন এখনও জগদগুরু শঙ্করাচার্য প্রমুখ মঠাধীশগণ চলেন। কালক্রমে তাঁরা ওই রঙের বসনও পরিধান করতে শুরু করেন। এই সন্ন্যাসীরাই ছিলেন এক কথায় এই দেশ, সমাজ তথা জাতীয় জীবনের আদর্শ তথা চলমান ত্যাগের প্রতীক— যজ্ঞাগ্নির তেজ এবং বেদের ভাণ্ডার স্বরূপ। বেদ, যজ্ঞ ও সন্ন্যাসী এই সনাতনত্রয়ীর কাছ থেকে লাভ করা যে জাতীয় প্রেরণা, ভারতীয়দের গৈরিক ধ্বজ হল তারই বাহ্য প্রতীক। সুদূর অতীত কাল থেকেই পরম্পরাগত ধারাবাহিকতার এই ধ্বজ তথা জাতীয় প্রতীক তাই কেবল রাজনৈতিক নয়, ধার্মিক, আধ্যাত্মিক, পরমার্থিক, এমনকি জাগতিক পথ প্রদর্শনকারী প্রেরণাস্থলও বটে। ধ্বজ এদেশে গুরুস্বরূপ বা গুরুস্থানীয়। আর এ জন্যই ভারতীয় সমাজ জীবনে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ধ্বজ বন্দনা বা ধ্বজ পূজা চলে আসছে পরম্পরাগতভাবে।

প্রাচীনকালে এবং এখনও কোন ধার্মিক প্রসঙ্গে অথবা গৃহপ্রবেশের সময় ধ্বজা উত্তোলন করার সময় বলার জন্য মন্ত্র ভবিষ্য পুরাণে দেওয়া আছে। মন্ত্র নিম্নপ্রকার। কেবল জানবার জন্যই মন্ত্র দেওয়া হচ্ছে।

।। ধ্বজোত্তোলনমন্ত্র ।।

এহি এহি ভগবন্ দেব দেবাহন বৈ খগ।
শ্রীকরঃ শ্রীনিবাসশ্চ জয় জৈত্রোপশোভিত।।
ব্যোমরূপ মহারূপ ধর্মাত্মন্ ত্বং চ বৈ গতেঃ
সান্নিধ্যং কুরু দণ্ডে অস্মিন্ সাক্ষী চ ধ্রুবতাং ব্রজ।
কুরু বৃদ্ধিং সদা কর্তুং প্রাসাদস্যার্কবল্লভ।।
ওঁ এহি এহি ভগবন্নীশ্বর বিনির্মিতি
উপরিচরবায়ুমার্জানুসারিন্ শ্রীনিবাস রিপুধ্বংস
যক্ষনিলয় সর্বদেব প্রিয় কুরু। সান্নিধ্যং শান্তিং
স্বস্ত্যয়নং চ মে ভয়ং সর্ববিঘ্না ব্যপসরন্তু।।

ভবিষ্যপুরাণ - ব্রাহ্মপর্ব ১৩৮।৭৩।৭৬

ভারতবর্ষ সগৌরবে ঘোষণা করেছিলো— "কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্"

সম্পূর্ণ বিশ্বকে আর্য্য মানে সুসভ্য করার আকাঙ্খা ভারত পোষণ করেছে। "হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী" কে শান্ত এবং সুসভ্য করতে আবশ্যক আছে ত্যাগ ত্যাগেই বাঁচার সম্ভাবনা থাকে। ত্যাগেই অমৃতত্ব আছে। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানুষুঃ" এবং এই ত্যাগের কামনা মানুষ মাত্রের মনে জাগাবার জন্য প্রাচীনকালে অগ্নিবর্ণ যজ্ঞের প্রতীক অন্ধকার বিনাশকারী সহস্ররশ্মি সূর্য্যের পতাকারূপে এই গৈরিক রঙ এবং পতাকাকে মানবজাতির সামনে আদর্শ রূপে অজানা কাল থেকে ভারতবর্ষ উপস্থিত করেছে।

আকৃতি নয়, রঙই গুরুত্বপূর্ণ

আকার বা আকৃতি যেমনই হোক না কেন কোন জাতির পরম্পরাগত রাষ্ট্রধ্বজ বা জাতীয় পতাকা হল তার জীবনদর্শনের দর্পণস্বরূপ। দর্পণের কাঁচ ছোট, বড়, চৌকো, তিনকোণা প্রভৃতি যেমন আকৃতিরই হোক না কেন তার মধ্যে দিয়ে কোন জিনিষকে দেখলে তা কি দর্পণের কাঁচের আকৃতির মত দেখাবে? নিশ্চয় নয়। যার প্রতিবিম্ব তারই পূর্ণ ও অবিকৃত রূপই প্রতিফলিত হবে। ঠিক তেমনি পতাকার আকার আকৃতির মধ্যেই ফুটে ওঠে রাষ্ট্রের অখণ্ড ও অবিকৃত প্রতিরূপ। সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতের জাতীয় পতাকার আকার-আকৃতি কোন বড় ব্যাপার নয়। আসল কথা হল ভারতবর্ষ নিয়ে। অর্থাৎ যে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রকাশ তাই নিয়ে। তবে রঙের গুরুত্ব কিন্তু এখানে অসীম। কারণ আকার-আকৃতির না হলেও রঙের পার্থক্যে প্রকৃতির পার্থক্য ঘটে থাকে।

প্রাচীন পরম্পরা

ঋগ্বেদ অনুসসরণ করলে দেখা যায় ভারতে ছোট ছোট রাজত্বকে একত্রিত করে বৃহৎ রাষ্ট্রের স্থাপনা করেছিলেন যিনি তিনি হলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের পতাকা ছিল গৈরিক।

পরবর্তীকালে অবশ্য একাধিক ইন্দ্র নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এক্ষেত্রে তা অবশ্যই প্রসঙ্গান্তরের ব্যাপার। কথা হল এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে দেবকল্পনায় যে রাষ্ট্রধ্বজ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাই নিয়ে। পাশ্চাত্য বিদ্যা ও প্রভাব নির্ভর পণ্ডিতেরা সেই স্মরণাতীত কালের অনেক কিছু নিয়েই প্রামাণ্য ঐতিহাসিকতার কূট প্রশ্ন তুলেছেন এবং প্রায় সব কিছুকেই মিথ' বা কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন

ভারতীয় ইতিহাসের ঘরানার প্রকৃতির গভীরে ঢোকার চেষ্টা না করেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দ্রধ্বজ কিম্বা বর্ণময় গৈরিক পতাকার রূপ পরিকল্পনা ও পরম্পরাকে নস্যাৎ কিম্বা বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত করতে পারেন নি।

অবশ্য এসব কথা বলতে গেলেই ধর্মের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বলে কূট প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে প্রশ্ন তুলতে পারেন তাঁরা ধর্ম তথা ভারতীয় জীবন সম্পৃক্ত হিন্দুধর্মের সম্পর্কে যাঁদের দারুণ এ্যালার্জি। কিন্তু ধর্ম তো মত অথবা বাদ নয়, বরং সমস্ত মতবাদের সমন্বয় হল ধর্ম। ধর্মের দেশ ভারতে অগ্নিবর্ণ গৈরিককে রাষ্ট্রীয় পতাকা করা হয়েছিল, কারণ অগ্নির প্রতিকণা তাপ ও দ্যুতির যে অবস্থান, বিশ্বের জন্য ধর্মের অবস্থানও অনেকটা তারই অনুরূপ। তাই অগ্নির বিভায় সমুজ্জ্বল তথা পবিত্র যজ্ঞাগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখার আকার ও বর্ণ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেই পতাকা। তার বর্ণব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত প্রজ্জ্বলিত হিরণ্যগর্ভের প্রথম প্রকাশের বর্ণচ্ছটা।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই পরম্পরাগতভাবে লক্ষ্য করা গেছে এদেশে এক একজন রাজার রথে শকটে উড়তে থাকত তাঁদের নিজ নিজ প্রতীক চিহ্নিত গৈরিক ধ্বজ। এমনকি ওই পতাকা-চিহ্নের থেকে সেইসব রথের নামকরণ পর্যন্ত স্থির করা হত। পতাকা দেখে দূর থেকেই বোঝা যেত কোন্‌টি কার রথ, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও বোঝা যেত কার অবস্থান কোথায়।

উদ্যৎ বিভাকর সমস্তিমিবাপহর্তা
সংখ্যে হুতাত্মহুতশোণিতশোণ বর্ণঃ।
ত্যাগস্য কেতনমুদীর্ণহুতাশনার্চিঃ
বিশ্বে সদা বিজয়তে ভগবৎধ্বজোহম্।।

জগতের অন্ধকার বিনাশকারী, সূর্যের মত অন্ধকার দূরকারী, রণাঙ্গনে প্রাণার্পনকারী হুতাত্মাগণের রক্তের রং যিনি প্রাপ্ত হয়েছে, অগ্নি থেকে উত্থিত হওয়া লেলিহান শিখার মত ত্যাগের পতাকাই বিশ্বে সর্বদা বিজয়ী পরম্পরা রক্ষা করে এসেছে। এটা নিছক কেবল কবি কল্পনামাত্র নয় এটা ভারতীয় পরম্পরাগত ভগবৎধ্বজার বাস্তবিক বর্ণনা যার পশ্চাতে রয়েছে এ দেশের হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক পরম্পরা তথা কৃষ্টি।

মৌর্য ও গুপ্ত রাজত্বের প্রতীক ছিল পুরাণের গরুড়ধ্বজ। সম্রাট অশোক যিনি পরে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেন, বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে ধ্বজাস্তম্ভ বসিয়েছিলেন ধর্মের কথা ছড়িয়ে দিতে। আমাদের জাতীয় পতাকায় যে ধর্মচক্র দেখি, সেটা সম্রাট অশোকের তৈরি সারণাথের সিংহ মন্দিরের মাথা উৎকীর্ণ আছে।

মধ্যযুগের ভারতীয় রাজপুত রাজারা তাঁদের রাজমর্যাদার প্রতীক হিসাবে ধ্বজা ব্যবহার করতেন। চিতোরের রাজারা মনে করতেন, তাঁরা সূর্যদেবের বংশধর, তা তাঁদের পতাকায় টকটকে লাল রং-এর উপর সূর্যদেবের ছবি আঁকা থাকতো। এগুলোকে বলা হত চাঙ্গি। হলদিঘাটের যুদ্ধে একসময় মহারাণা প্রতাপকে মুঘলরা একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। সেইসময় রাণার এক সেনাপতি ঝালার মান নিজের মাথার উপর পতাকা উড়িয়ে মহারাণাকে রণক্ষেত্রের বাইতে নিতে পেরেছিলেন। মেবারের ঐ সূর্যনিশান (চাঙ্গি) মাথায় ওড়ানোয় রাণার ঐ সেনাপতিকে আক্রান্ত হতে হয়েছে অবশ্যই তবে এর ফলে রাণা প্রতাপের প্রাণ বেঁচেছিল।

মুঘলদের রাজপতাকা ছিল শেওয়া-সবুজের ওপর সোনালী রং দিয়ে আঁকা। সুবজ মাঠের ওপর সদ্য ওঠা সূর্যের খানিক ঢেকে আছে এক রাগী সিংহ। পতাকাদণ্ডের দিকে তার মুখ।

পৌরাণিক দেবতা বিষ্ণু ও শিবেরও ধ্বজা ছিল। ভগবান বিষ্ণুর গরুড় ধ্বজা (ঈগল) এবং মহাদেবের বৃষভ-ধ্বজা (ষাঁড়)। মহাকাব্যের যুগে রাজা-রাজড়ার বা বীর যোদ্ধার সবারই নিজস্ব পতাকা ছিল। নিজের পারিবারিক বিশ্বাস অনুযায়ী বা যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁরা সেগুলো গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের শক্তিমত্তার প্রতীক ছিল পতাকা।

অযোধ্যার রাজা রাণা তাঁর পারিবারিক পতাকাকে নিজের বলে মনে করতেন। এতে গেরুয়া রঙের ওপর কুলদেবতা সূর্যের নকসা ছিল। তাঁর ছোট ভাই রাজকুমার ভরত 'কোবিদার ধ্বজা' (এক সুন্দর অলৌকিক গাছ) গ্রহণ করেছিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের দুটো পতাকা ছিল। একটা তাঁর রাজত্বের প্রতীক, দ্বিতীয়টা তার ব্যক্তিগত। যাতে চিহ্ন হিসাবে থাকত মানুষের খুলি। তাই ভালো বীণা বাজাতে পারতেন। নিজের জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন হিসাবে তিনি রাজানিশানে বীণার ছবি এঁকেছিলেন। ছেলে মেঘনাথ নিজের পতাকায় সিংহের ছবি বেছে নিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদের পতাকার কথাটি বড় করে বলা হয়েছে মহাভারতের শান্তি পর্বে। আর দ্রোণ পর্বে বলা আছে কৌরবদের কথা। পাণ্ডবদের

বড়োভাই যুধিষ্ঠিরের পতাকার মন্দ-উপমন্দ নামে একজোড়া মৃদঙ্গ থাকত। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ছিল সিংহ ধ্বজা। বীর অর্জুনের বিখ্যাত কপিধ্বজায় হিংস্র বানরের ছবি আঁকা। নকুলের পতাকায় 'সারভ' (পৌরাণিক জন্তু) এর ছবি আঁকা। সহদেবের হংসধ্বজায় — রাজহাঁসের ছবি ছিল। অভিমন্যুর পতাকায় সারঙ (পাখি) এর নকশা ছিল। ভগবান বিষ্ণুর অবতার সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের ছিল 'গরুড় ধ্বজ'। পিতামহ ভীষ্মের ছিল "তালধ্বজা"। তাতে তালগাছকে ঘিরে পাঁচটা তারা। গুরু দ্রোণাচার্যের 'বেদিকা' (পূজোর বেদী) হরিণের চামড়ায় মোড়া ছিল। তার উপরে কমণ্ডলু ও ধনুকের ছাপ। কৌরব রাজকুমার দুর্যোধনের রথে লাগানো থাকতো 'সর্পধ্বজা'। মহান বীর কর্ণের রথে থাকত 'হস্তিকাশ্যামাহর কেতু' (হস্তি শিকল) কোনও কোনও শাস্ত্রে তাঁর পতাকায় সূর্যের চিহ্ন ছিল।

গগন মেঁ লহরতা হ্যায় ভগোয়া হামারা

—অটল বিহারী বাজপেয়ী

ঘিরে ঘোর ঘন দাসতাকে ভয়ঙ্কর
গঁবা বৈঠে সর্বস্ব আপস মেঁ লড়কর
বুঝে দীপ ঘর ঘর হুয়া শূন্য অম্বর
নিরাশা নিশানে জো ডেরা জমায়া— য়ে জয়চন্দকে দ্রোহ কা দুষ্ট কাল হ্যায়
যো অবতক অন্ধেরা সবেরা ন আয়া
মগর ঘোর তম মে পরাজয়কে গম মে বিজয় কী বিভা লে
উষা কে বসন দুশ্মনো কে নয়ন মে, চমকতা রহা প্রাণ ভগোয়া হামারা।।
মিটে দেবতা মিট গয়ে শুভ্র মন্দির
লুটী দেবীয়াঁ লুট গয়ে সব নগর ঘর
স্বয়ং ফুটকি অগ্নি মেঁ ঘর জ্বালা কর পুরস্কার হাথোঁ মে লোহে কি বেড়িয়া
কুপতোঁ কী মালা খড়ী আজ ভী হ্যায় ভরে আপনে আখোঁ মে আঁসু কী লড়িয়াঁ
মগর দাসতা কে ভয়ানক ভঁবর মে, পরাজয় সমর মে
আখিরী ক্ষণোঁ তক শুভাষা বন্ধানা কি ইচ্ছা জাগাতা কি সবকুছ লুটা কর
কি সব কুছ মিলানে
বুলাতা রহা প্রাণ ভগোয়া হমারা।।
ভগোয়া হ্যায় পদ্মিনী কী জৌহর কী জ্বালা, মিটাতী অমাবস্ লুটাতী উজালা।
ক্যায়া নয়া কে ইতিহাস রচ ন ডালা?
চিতা কে জ্বলনে হাজারোঁ খড়ী থী, পুরুষ সব মিটে নারিয়াঁ সব হবন কী

সমিধ বন অনল কে পগোঁ পর চঢ়ী থী
মগর জোহরোঁ মে, ঘিরে কোহরোঁ মে, কী বলি কে ক্ষণোঁ মে
সভী শত্রুয়োঁ কে সরোঁ পর অনল বন, বধকতা রহা জ্বাল ভগোয়া হামারা।।
কভী এক থে, হুয়ে আজ ইতনে
নহী তব ডরে তো ভলা অব ডরেঙ্গে
বিরোধোঁ কে সাগর মে চট্টান হ্যায় হাম, যো টকরায়েঙ্গে মৌত অপনি মরেঙ্গে
লিয়া হাথ মে ধ্বজ কভী ন ঝুকেগা, কদম বঢ় রহা হায়, কভী ন রুকেগা
ন সুরজ কে সম্মুখ অন্ধেরা টিকেগা
অডর হ্যায় সভী হাম, নিডর হ্যায় সভী হ্যাম, কী সর পর হমারে বরদ, হস্ত করনা

লহরতা রহা প্রাণ ভগোয়া হমারা

গগন মে লহরতা হ্যায় ভগোয়া হমারা।।

ভারতের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি তথা এর বৈভবশালী ইতিহাস যত প্রাচীন, ভগবৎধ্বজ বা গৈরিক পতাকাও তত প্রাচীন। বৈদিক কাল থেকেই চলে আসছে এই উপত্যকার পরম্পরা।

বেদেঅরুণ সন্তু কেতব, অর্থাৎ সুবর্ণ-গৈরিক পাকার উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদের শ্লোকে রয়েছে—

"অহশ্র অসৎ কেতবো বি রময়ো, জবাঁ অনু ভ্রাজন্তো অগ্নোয়ো যথা"।

অথর্ববেদে এই পতাকাকে অরুণ, তাম্র, কাশায় অরুষ ইত্যাদি নামে উল্লেক করা হয়েছে।

উত্তিষ্ঠত সংনহাধ্বং উদারাঃকেতুভিঃসহ।
সর্পা ইতরজনাঃ রক্ষাংসি
অমিত্রান্ অনুধাবত।
ঈষাং বো বেদ রাজ্যং ত্রিষন্ধে।
অরুণৈঃ কেতুভিঃ সহ।
যে অন্তরীক্ষে যে দিবি পৃথিব্যাং যে চ মানবাঃ।।

অথর্ববেদ ১১।১০

হে পৃথিবীর সব মনুষ্যগণ! মনে রাখো এ রাজ্য তোমাদের। সবাই মিলে হাতে উদার অরুণ কেতু নিয়ে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য সর্পের মত তড়িৎ বেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়। আপনজন রক্ষা কর। অথর্ববেদ ১১।১০

যজুর্বেদেও বলা হয়েছে—

অসৌ স যস্তাম্রো অরুন উত বভ্রুঃ সমঙ্গলঃ।
নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নমস্তাম্রায় অুরচনায় চ।।

বাল্মিকী রামায়ণে উল্লেখ আছে রামচন্দ্রের স্বর্ণধ্বজার। পতাকা এবং তার উত্তোলন সম্পর্কে একটি গোটা অনুচ্ছেদই আছে পদ্মপুরাণে। মহাভারতে পাওয়া যায় অর্জুনের রত্নজ্যোতি সিন্দুর অর্থাৎ লালচে হলুদ বা গেরুয়া পতাকার কথা। শ্রীকৃষ্ণের রথের মাথায় উড়ত গরুড় চিহ্নিত গৈরিক পতাকা। অর্জুনের পতাকায় ছিল কপি চিহ্ন। এর থেকেই শ্রীকৃষ্ণের রথের নাম হয়েছিল 'গরুড়ধ্বজ', 'কপিধ্বজ' নাম ছিল অর্জুনের রথের। কৌরবদের একমাত্র বোন দুঃশলার স্বামী সিন্ধুর রাজা জয়দ্রথের ছিল বরাহ চিহ্নিত গৈরিক পতাকা। হিন্দু রাজারা প্রায় সকলেই গৈরিক পতাকা ব্যবহার করতেন। এটি ছিল সমগ্র ভারতের প্রতি তাঁদের পরম আনুগত্য তথা এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয় সত্বায় একাত্ম হয়ে থাকার প্রমাণ। প্রত্যেকে ওই গৈরিকের উপর কেবল নিজ নিজ প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে নিজ নিজ স্বকীয়তার পরিচয় বহন ও প্রদর্শন করতেন।

উদাহরণ স্বরূপ ছত্রপতি শিবাজী, হরিহর বুক্ক, প্রতাপ রুদ্র প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা নিজ নিজ স্বাধীন সাম্রাজ্যে প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে গৈরিক পতাকাকেই তাঁদের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। শরীফ-এ হোসেনশাহ-এর থেকে জানা যায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতাকা ছিল গৈরিক। তালিকোটের লড়াইয়ে বিজয়নগরের সেনাবাহিনী ওই পতাকা নিয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শিবাজী মহারাজ তো নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেও ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তথা গৈরিক পতাকার প্রতিনিধিমাত্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রতিনিধি' কবিতায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এইভাবে—

গুরু কহে তবে শোন, করিলি কঠিন পণ
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য ল'য়ে রবে রাজ্যহীন'।
'বৎস তবে এই লহো মোর আশীর্ব্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।'
কহিলেন গুরু রামদাস।

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি লোকমান্য তিলক ১৯০৭ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁর উপস্থিতিতে শিবাজির রাজ্যাভিষেক উৎসবে ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে কবিগুরু যে স্বরচিত 'শিবাজী উৎসব' কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তাতে গৈরিক পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিবাজির উক্তি স্বরূপে লেখেন, —

"ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন,
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।"

গৈরিক পতাকাই যে সনাতন ভারতের চিরন্তন প্রতীক কবিগুরুর এই লেখার মধ্যেও তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ।" অর্থাৎ মহান ভারতের সাংস্কৃতিক ধ্যানমন্ত্রে একাত্ম হয়ে গৌরবান্বিত হবে সমগ্র বিশ্ব। হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর পতাকা ছিল পূর্ণ গৈরিক। ভারতাচার্য বৈদ্য'র শিবাজী নিবন্ধাবলী'তে পতাকার যে বর্ণনা আছে সেখানে 'শিসোলে ভোঁসলে' নামের সামনে 'নিশান ভগবে'র উল্লেখ আছে। শিবাজীর পতাকাটি এখন রয়েছে পুণের ইতিহাস সংশোধন মণ্ডল-এর তত্ত্বাবধানে। পেশোয়ারও গৈরিক পতাকা ব্যবহার করতেন, যা শিবধ্বজ নামে পরিচিত ছিল। যতদূর জানা যায় বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্যকে একত্রিত করার জন্য অটকে রাঘবদাদা যে দরবার আহ্বান করেছিলেন তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গৌরবশালী গৈরিক পতাকা তুলে।

যজ্ঞের অগ্নি বহন করা সম্ভব নয় বলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাইরে এদেশের মুনিঋষিরা যজ্ঞাগ্নির প্রতীক স্বরূপ গৈরিক পতাকা নিয়েই ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করতেন। জগদগুরু আদি শঙ্করাচার্য যেমন ভারতের চার কোণে এই পতাকা বহন করেছেন তেমনি রামায়ণের আমলে মহামুনি অগস্ত্য, মহাভারতের কালে কৌণ্ড কৌণ্ডিণ্য প্রমুখ বহন করেছেন ভারতের বাইরেও। সাম্প্রতিক কালে এই পতাকা গ্রহণ এবং জনপ্রিয় করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস)।

বৃহত্তর ভারতে গৈরিকের প্রভাব

এক সময় ভারতের বাইরে যেসব দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেক রাষ্ট্র বা জাতিই তাঁদের জাতীয় পতাকায় আজও গৈরিকের

প্রাধান্য বজায় রেখে যাচ্ছেন। কেবল যেগুলি ইলামী রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত হয়েছে গৈরিককে বর্জন করে তাদেরই অনেকে গ্রহণ করেছে সবুজকে।

বিশ্বের মধ্যে নেপালই একমাত্র ঘোষিত 'হিন্দুরাষ্ট্র'। এর জাতীয় পতাকার আকার দুটি শিখা বা ত্রিভুজের মত যার উপরটির মধ্যে সাদা রঙের চন্দ্র-তারা এবং নিচেরটির মধ্যে একটি সূর্য অঙ্কিত। ভূটানের জাতীয় পতাকা চৌকো এবং মাঝামাঝি থেকে দ্বিখণ্ডিত দুটি ত্রিভূজ আকৃতির উপরের অংশ হল গাঢ় হলুদ, নিচের অংশের রং গৈরিক। ঠিক মাঝামাঝি উভয় রঙের উপর অঙ্কিত একটি ড্রাগন চিহ্ন। চৌকো আকৃতির শ্রীলঙ্কার জাতীয় পতাকার ধ্বজ দণ্ডের দিকে প্রথমে হলুদ, তারপর সবুজ এবং তার পাশে গৈরিক রং প্রত্যেকটি লম্বভাবে অবস্থিত। তারপর বাকী অংশ খয়েরি রঙের এবং তার মধ্যে সুবর্ণ হলুদে অঙ্কিত তলোয়ারধারী একটি সিংহমূর্ত্তি। তিব্বতী পতাকাও ড্রাগন চিহ্নিত গৈরিক।

সবুজ ইসলামের নয় মোঘলদের রং

ভারতের সর্বস্তরের মানুষেরই স্থির বিশ্বাস জাতীয় পতাকা বলতে যা বোঝায় এদেশে বহুদিন ধরেই তার পরম্পরাগত প্রচলন ছিল। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান সম্পদগুলি অর্থাৎ জ্ঞান, শক্তি, সাম্য, মৈত্রী, ত্যাগ, ভক্তি ও ধর্মের প্রতীক স্বরূপ সেই গৈরিক পতাকা 'ভগোয়া' নামেও পরিচিত। এই পতাকা নিয়েই ভারতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মোঘল আমলে। রাণাপ্রতাপ, গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রমুখও এই পতাকা ব্যবহার করতেন। বাংলার পাল রাজারা যে গৈরিক পতাকা ব্যবহার করতেন একথা ইতিহাসেই পাওয়া যায়। রাজস্থানের জয়পুরের প্রাচীন সংগ্রহশালায় বাপ্পা রাওয়ালের সময় থেকে চলে আসা গৈরিক পতাকার নিদর্শন রয়েছে।

১৮৫৭ সনে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে কথিত স্বাধীনতার মহাবিদ্রোহীরা দিল্লীর লালকেল্লায় প্রবেশ করেও শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা লাভে ব্যর্থ হন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর এস সে-র দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধবরাও গোলওয়ালকর) বলেছিলেন মহাবিদ্রোহীরা যে পতাকা নিয়ে লালকেল্লায় প্রবেশ করেছিলেন তা ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের সবুজ পতাকা। অথচ ভারতের মানুষ কোন কারণেই মোঘল সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সবুজ রং ইসলামের নয়, এটি ছিল মোঘলদের। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ জিলানীর একটি বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৬৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর 'অর্গানাইজার' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন যে, ইসলামের প্রবর্ত্তক

(হজরত মহম্মদ) অনেক যুদ্ধেই গৈরিক সহ অনেক রঙের পতাকা ব্যবহার করলেও কখনও সবুজ পতাকা ব্যবহার করেন নি। জিলানীর মতে সবুজ ছিল মোঘলদের রং—ইসলামের নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় মৌলবী লিয়াকত হোসেন ভারতের জাতীয় জনজাগরণের প্রতীক হিসাবে কলকাতার পথে পথে যে পতাকা তুলে ধরেছিলেন সেটিও ছিল গৈরিক। সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি ভগোয়া পতাকা নিয়ে যে আন্দোলন করেছিলেন কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট থেকে শুরু করে জনসঙ্ঘীরা পর্যন্ত সকলেই সেই পতাকাতলে সমবেতভাবে তাঁদের অভিযান চালিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রেও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে গৈরিক পতাকা ছিল জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

শ্রমিক আন্দোলনে গৈরিক পতাকা

পঞ্চাশের দশকের আগে পর্যন্ত এ দেশে সমবেত শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হত সোভিয়েত বিপ্লবের লাল পতাকা নিয়ে। তারপর ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ গৈরিক পতাকা গ্রহণ করে এবং এখনও পর্যন্ত সেই পতাকাই ব্যবহার করে যাচ্ছে বি.এম.এস.। কিন্তু বি এম এসেরও আগে শ্রীডাঙ্গে তার এস এম এসের জন্য গৈরিক পতাকা গ্রহণ করেছিলেন। এসব থেকেই প্রমাণ এদেশে গৈরিক পতাকার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস চলে এসেছে, অর্থাৎ এটিই ভারতের পরম্পরাগত শাশ্বত ধ্বজ।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কেবল শাসন ক্ষমতাই যে কোন জাতির জাতীয় সত্ত্বার পূর্ণ প্রকাশ নয় এই অতি সহজ অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি আমাদের অধিকাংশ জাতীয় নেতাই উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন নি। ফলে ফিরিয়ে আনা হয়নি ভারতের এই সুপ্রাচীন জাতীয় সম্পদকে। ধর্মীয় ও কিছু কিছু সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে এখনও গৈরিক পতাকা শ্রদ্ধার আসন পেলেও যেহেতু জাতীয় পতাকা হিসাবে তাকে সরকারীভাবে গ্রহণ করা হয়নি সেজন্য কোন সরকারী কার্যক্রমে তা উত্তোলিত হয় না।

শেষ চিহ্নও মুছে ফেলা হয়েছে ১৯৭৫ সালে

সংবিধান পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রদেশগুলির রাজ্যপালদের শকটে এবং তাঁদের রাজভবনগুলির মাথায় অশোকস্তম্ভ ও 'সত্যমেব জয়তে' লেখা গৈরিক পতাকা শোভা পেত। কিন্তু বর্তমান ভারতকে তার থেকেও

বঞ্চিত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময় এক অধ্যাদেশ জারি করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গৈরিক পরম্পরা পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে রাজ্যপালদের জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। আর এইভাবেই ফের কুটিল রাজনীতির শিকার হতে হয় ভারতের পরম্পরাগত মহান ত্যাগের প্রতীককে।

এখনও গৃহীত হতে পারে

বলা বাহুল্য, এখনও খুব বেশি দেরী হয়ে যায় নি। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে অনেক দেশই তার জাতীয় পতাকার পরিবর্তন করেছে। ইচ্ছা করলে ভারতবর্ষও তার পরম্পরাগত প্রাচীন গৈরিক পতাকা গ্রহণ করতে পারে। তাতে ভারতের জাতীয় জীবনের মূল বরং আরও বেশি সুদৃঢ় ও গভীরতর হবে। কারণ তার সঙ্গে সংপৃক্ত হবে ভারতের সুপ্রাচীন গৌরবময় সংস্কৃতির সনাতন ধারা।

সনাতন গুরু

গৈরিক ধ্বজা ভারতের কেবল রাজনৈতিক পতাকা নয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয়, সব কিছুরই মূর্ত প্রতীক। এমন কি প্রকৃতি পূজারও। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের সবেতেই এদেশে গৈরিক ধ্বজের প্রাধান্য। সর্বত্র তা গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত। কারণ ভারতীয় জীবনচর্চা ও চর্যার যাবতীয় কিছুর মূল উৎস যে ত্যাগ, গৈরিক তারই সামগ্রীকতার প্রতীক। এ জন্যই ভারতের সর্বত্র যুগ যুগ ধরে ধ্বজ পূজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এ কেবল তথাকথিত ধর্মভীরুতা বা গুরুবাদের তথাকথিত কুসংস্কার নয়, ভারতীয় জীবনযাত্রার সর্ববাদী সমমত ও সর্বজন গৃহীত এক মৌলিক সিদ্ধান্ত। এর মধ্যে কোন আঞ্চলিকতা ও বিশেষ লোকাচারেরও ব্যাপার নেই। এ হল সর্বভারতীয় ভাব এবং ঐক্যের বিকাশ ও বিনিময়ের মুক্ত প্রকাশ। বাঙ্গালীরাও এর বাইরে নন।

ধ্বজ পূজার পরম্পরা

ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব' প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহার পরিচিত তাঁহারা জানেন, গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি নানা প্রকারের ধ্বজপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না; ঐতিহাসিক প্রমাণও কিছু কিছু আছে।

শক্রধ্বজা ও ইন্দ্রধ্বজার পূজা যে একাদশ শতকের আগে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ তো গোবর্ধন আচার্য-ই রাখিয়া গিয়াছেন। শক্রথান ও শক্রধ্বজা পূজার কথা জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নাম প্রাচীন কালের রাজ-রাজড়ার ভিতর একেবারে অপ্রতুল নয়। এক একে কৌম* বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষী লাঞ্ছিতা ধবিজা; সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কৌমগত পূজা এবং তাহাই তাহাদের পরিচয়; সেই কৌমের যিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁহার নামে তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ বা হংসধ্বজ। এই ধরণের পশু বা পক্ষী লাঞ্ছিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষী হইতেই উদ্ভুত; বহু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ কল্পনায় তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ আমদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন। দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কুর্ম। সমস্তই সেই আদিম পশুপাখী তথা প্রকৃতি পূজার অবশেষ।" আদিম কৌমগত পূজার উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে এইসব পশুপক্ষীরাও আজও আমাদের পূজা লাভ করে থাকে। দেবদেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে এইসব ধ্বজ পূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। দেবদেবী বা মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভের উপর বা মন্দিরের চূড়ায় উড্ডীয়মান ধ্বজ বা কেতনের পূজা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বেশনগরের (মান্দাশোর—মধ্যপ্রদেশ) সেই গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ, মকলকেতন প্রভৃতির পূজা হতে আরম্ভ করে বর্তমানের চড়ক পূজা, ধর্মপূজা, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কোন ধর্মকর্ম ধ্বজ এবং ধ্বজ পূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না বলা চলে। সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে ধর্মস্থান বা থানের সঙ্গে ধ্বজ এবং ধ্বজপূজার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

এই প্রচলিত সনাতন ধারা অনুসরণ করেই 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' ধ্বজ বন্দনা ও ধ্বজ পূজাকে চিরন্তন ভারতীয় তথা হিন্দু আদর্শের পুনর্মূল্যায়ন বলে মনে করে আসছে। বস্তুতঃ সঙ্ঘ কোন নতুন জিনিষ সৃষ্টি করতে চায়নি বা চায় না। বিশ্ব সংস্কৃতিতে সম্ভবতঃ এমন কোন বিষয় নেইও যা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণা ও সাধনা বহির্ভূত। ত্যাগই যে সর্বপ্রধান শক্তি এবং ভক্তিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা সমর্পণ, সঙ্ঘ এই বিশ্বাসে অটল। গৈরিক পতাকাই যে ভারতের সর্বাঙ্গীনতার

প্রতীক সঙ্ঘ এই সত্যাশ্রয়ে বিশ্বাসী। এজন্য সঙ্ঘের প্রতিটি শাখায় নিত্যদিন গৈরিক ধ্বজের সামনে বুকে হাত দিয়ে, হৃদয়কে স্পর্শ করে শুরু হয় কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ। এই ধ্বজের নিচে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা শুরু হয়— 'নমস্তে সদাবৎসলে মাতৃভূমে....' দিয়ে আর 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে শেষ হয় সে প্রার্থনা। এও এক ধরণের নিত্যপূজা। প্রতিটি শাখা একপ্রকার প্রাঙ্গন-তীর্থ। সনাতন প্রথা অনুসারে সঙ্ঘ প্রতি বছর ব্যাসপূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমার দিনে গুরুজ্ঞানে এই ধ্বজের পূজাও করে থাকে। কারণ অনুপ্রেরণার উৎসকেন্দ্র ও শক্তির আধার হিসাবে সঙ্ঘ কোন ব্যক্তিকে গুরু হিসাবে বরণ করার বদলে স্বীকার করে নিয়েছে সনাতন গুরু গৈরিক ধ্বজকে!

গুরু উন্নত জীবনের পথিকৃৎ

ভারতীয়ত্বে 'গুরু' কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দ্যোতক নয়। গুরু এখানে গুরুত্বের প্রতীক, গরিমার প্রতীক, প্রতীক পূর্ণত্বেরও। গুরু হলেন তিনি যিনি নিজে পূর্ণ হয়ে অন্যকে পূর্ণ করেন। গুরু মহতী চেতনার প্রতীক, উন্নত জীবনের পথিকৃৎ। নিউ ইয়র্কে 'ভক্তি' সম্পর্কে এক ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন, — "যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে 'গুরু' বলে।" .... "এই শক্তি সঞ্চার করিতে হইতে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন তাঁহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক।" গৈরিক পতাকার আত্মা থেকে ত্যাগের শক্তি সঞ্চারিত হয়, সুতরাং গুরুজ্ঞানের গৈরিক ধ্বজের পূজা তাই মহত্তর জীবনের অঙ্গীকার তথা উন্নত আদর্শের মহাবেদীতে আত্মনিবেদন ও পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উৎসব বিশেষ।

গুরুকে সচল তথা মর্ত্যদেহধারী হতেই হবে এমনও কোন কথা নেই। মর্ত্যদেহ ধারণ না করে অথবা নিকটে না থাকলেও 'গুরুশক্তির' উপর অটুটভাবে আস্থা স্থাপন করে মানুষ আপ্তকাম হতে পারে। এখানে গুরু হলেন মহৎ অনুপ্রেরণা। গুরু দ্রোণাচার্যের চলমান সাক্ষাৎ ছাড়াই একলব্য কেবল তাঁর প্রতিমূর্তি থেকে অনুপ্রেরণার অনুভূতির মাধ্যমেই অস্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শিখরা তো তাঁদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'কেই গ্রন্থগুরু বা গুরুগ্রন্থ বলে থাকেন। গুরু একধরণের ঐশ্বরিক শক্তি বা তেজ যা কারো উপরে সঞ্চারিত হলে তার সুপ্ত শক্তি বা প্রতিভার স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটে।

---

* 'কৌম' শব্দের অর্থ সম্প্রদায়। ইংরেজীতে 'Community'

তিনি গরিয়ান

গুরুবন্দনার কথা কেবল যে সনাতন ভারতেই আগমে, নিগমে, সাধনায়, ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে তা নয়। ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্মের মধ্যেও এ ধরণের গুরুপূজা ও তার কাছে সর্বস্ব তথা আত্মসমর্পণের ধারা প্রচলিত ছিল। দস্তয়েভস্কির 'ব্রাদার্স ক্যারামাজভ' পুস্তকের প্রথমভাগে এ রকম একজন রাশিয়ান গুরুর কথা আছে যাঁর নাম 'ফাদার জোসিমা'। খৃষ্টধর্মে এই আচার্যকে বলা হত 'The Elder' বা 'তিনি গরিয়ান' অর্থাৎ গুরু। পার্শীদের মধ্যেও প্রাচীনকাল থেকেই গুরুপ্রথা প্রচলিত। সুরসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খাঁ গেয়েছেন, 'গুরু বিন জ্ঞান না পাওয়ে'—গুরু বিনা জ্ঞানলাভ করতে পারবে না।

গুরুর প্রয়োজন কেন.... ?

কেউ কেউ মনে করেন মানুষের নিজস্ব বিচার বুদ্ধি,কৌশল এবং শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আবার গুরুর প্রয়োজন কি? এর উত্তরে মহাভারতের ভীষ্মপর্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। গীতায় এখানে বলা হয়েছে—

"যয়াধর্মম্ অধর্মং চ কার্যং কার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।
অর্ধমং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।"

অর্থাৎ লৌকিক জগতে দেখা যায় মানুষের নানা বিষয়ে বিচার বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও মানুষ কোন কোন অজ্ঞাত স্থানে কখনো কখনো পথভ্রান্ত হয় এবং নিজের ভুল নিজে বুঝতে পারে না। তাছাড়া লৌকিক বিষয়ে মানুষের বিচার-বুদ্ধি থাকলেও পারমার্থিক বিষয়ে মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রান্ত। বেঠিককেই অনেক সময় সঠিক বলে মনে করে। রজোঃ ও তমো বুদ্ধিতে মানুষ ধর্মাধর্ম ও কর্মাকর্ম নির্ণয়ে অসমর্থ।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মহামুনি বশিষ্ঠদেবকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যু ও সান্দীপানিকে, আদি শঙ্করাচার্য গোবিন্দপাদকে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতীকে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। এ ধরণের রাজর্ষি ও সাধকবৃন্দ ছাড়াও বড় বড় সম্রাট ও রাজন্যবর্গরাও এর ব্যতিক্রম নন। রাজা বিন্দুসার, সম্রাট অশোক, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, ছত্রপতি শিবাজী প্রমুখ গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে ভগবান বুদ্ধ, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, সর্বত্যাগী চাণক্য ও সমর্থস্বামী রামদাসকে। শুধু তাই নয় ঐসব মহান

গুরুর পথনির্দেশে এই সকল রাজন্যবর্গ কেবল য নিজেরাই মহান হয়েছিলেন তাই নয়, এঁদের শাসনকালের গৌরবময় কীর্তিগুলো সর্বকালের জন্য কিংবদন্তীতুল্য হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এই মহাত্মাগোষ্ঠীর কেউ তো কোন দিক দিয়েই কম ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধ্যাত্মধর্ম, রাজধর্ম, সমাজধর্ম ও জাতিধর্মের রক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য এঁদেরও গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বেদ, পুরাণ, স্মৃতি সর্বত্রই বহু পরীক্ষিত গুরুর একান্ত আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়েছে।

উপনিষদে বলা হয়েছে—

"তমেব বিদ্বিতাঽহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।।"

অর্থাৎ, একমাত্র তাঁকে জেনেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে।... লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়—সমস্ত রকম ভয় থেকে মানুষ তখন মুক্ত হতে পারে। গুরুর অনুপ্রেরণায় ভয় ভেঙ্গে যায় সকল লোকের, সকল রোগের, সকল শোকের, সকল রকম ভয়ানকের। ভয় হতে অভয় মাঝে তখন মানুষের উত্তরণ ঘটে। মানুষ তখন এক নূতন জীবনে প্রবেশ করে। জীবন ও জগতের পরিবর্তনের মাঝে এই যে অপরিবর্তনীয় সত্ত্বার অবিনশ্বর অস্তিত্ব, এটাই ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী। আর এই বাণীর বাহক ও প্রচারকরা হলেন গুরু। ত্যাগই তাঁদের মহামূল্যবান সম্পদ। গুরু হলেন তিনি যিনি বিশ্বের অজ্ঞানকে বিনষ্ট করে জ্ঞান দান করেন, যিনি বিশ্বের ভ্রম বিদূরিত করে বহ্মরূপী সত্যসত্ত্বার প্রকাশ ঘটান। জীবকে সত্য, শিব ও সুন্দরে রূপান্তরিত করাই গুরুর অবদান। তাই ভারতের ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে গুরুপূর্ণিমার দিনে এই শিবের উদ্বোধনের প্রার্থনায় যুগ যুগ ধরে প্রণতি জানিয়ে বলা হচ্ছে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

গুরু সর্বতমসা বিদূরক

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'গু' মানে অন্ধকার আর 'রু' মানে জ্যোতিঃ। অর্থাৎ অন্ধকার নাশকারী। এককথায় যিনি সমস্ত রকমের অন্ধকার দূর করেনি তিনিই গুরু। সেজন্য

গুরু নির্বাচনের সময়ই তিনি সৎ ও সর্বত্যাগী কিনা তা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। তাছাড়া তাঁর অন্তঃস্থিত শক্তি সমাজ তথা জাতিকে এই প্রশিক্ষণে উন্নত করার সহায়ক কিনা তাও লক্ষণীয়। কারণ মূল ভারতীয় সমাজ হল প্রশিক্ষিত সমাজ। যে কোন বিষয়ে আশ্রম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং নেওয়া এ সমাজের সুপ্রাচীন পরম্পরা। এরইজন্য এখানে সুব্যবস্থিত বর্ণাশ্রম ছিল মানবজীবনের বিজ্ঞানসম্মত চার অধ্যায়। আশ্রমগুলিতে কেবল ধর্মশাস্ত্র পঠনপাঠনই নয়, বিভাগীয় স্তরে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবনেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এক কথায় তখনকার আশ্রমগুলি ছিল সর্বজ্ঞানের সাধনক্ষেত্র বা Multipurpose Research Centre. কণ্বমুনির আশ্রমে তাই দেখি গার্হস্থ্য জীবনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে শকুন্তলাকে। আরুণিকে দেখি গুরু আশ্রমের কৃষিক্ষেতের জল আটকাতে আলের উপর শুয়ে থাকতে।

এখনও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্প বা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণ মিশন, সংস্কার ভারতী, ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত আশ্রম বা প্রশিক্ষণ প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বিদ্যার্থীদের বিদ্যাভ্যাসই কেবল উন্নত মানের নয়, এখানকার শিক্ষার্থীদের নৈতিক মানও অন্যদের থেকে অনেক ভাল হচ্ছে। অর্থাৎ সমাজ জীবনের সর্বদিকে পারদর্শিতার জন্য আশ্রম প্রধান তথা গুরুকেন্দ্রিক (Trainer based) শিক্ষার অনিবার্যতা আজও অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না।

আশ্রম সাম্যের প্রতীক

প্রাচীনকাল থেকে এই শিক্ষাধারা চলে আসছিল গুরুগৃহে বা প্রশিক্ষণের আশ্রমে। সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক স্তর বিন্যাসের কোন পার্থক্য ছিল না। রাজপুত্র কোটালপুত্রের সঙ্গে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুত্রের শিক্ষাক্রমে বা সামজিক ব্যবহারে এমন কি জাগতিক জীবন ধারণে তথা প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের কোন প্রশ্নই উঠত না। ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, উঁচ-নিচু, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যভেদের কোন কল্পনাও করা যেত না ওইসব আশ্রম বা গুরুগৃহে। শিক্ষার্থীদের একমাত্র পারস্পরিক পরিচয় ছিল 'গুরুভাই'। আর শিক্ষক ছিলেন বহুগণসম্পন্ন পরম শ্রদ্ধেয় 'গুরু' যিনি সকলের মধ্যেই সমানভাবে সঞ্চারিত করতেন তাঁর আরব্ধ ও উপলব্ধ ক্ষমতা। তাঁরা নিজেরা সাধনা বা রিসার্চ করে সিদ্ধিলাভ করতেন, ঋষি হতেন, শিষ্যদেরও সাধনা করাতেন, জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। এর ফলে অতি সাধারণ বুদ্ধির শিক্ষার্থীরাও কালক্রমে হয়ে উঠতেন অনন্য প্রতিভাধর। কোমলমতি শিশুহৃদয়ের সুকুমার

প্রবৃত্তিগুলি আদর্শ লক্ষ্যে স্থির প্রতিষ্ঠ হয়ে কখন যে সমাজসেবকের রূপ নিত তা তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারতেন না।

ভক্তিই সর্বোত্তম গুরুদক্ষিণা

শিক্ষান্তে শিষ্যরা দিতেন গুরুদক্ষিণা। সেও এক কঠিন পরীক্ষা। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধনের অর্থের মাপে সে পরীক্ষার মান নির্ণয় হয়নি কোনদিন। গুরুদক্ষিণার মান নির্ধারিত হয়েছে আন্তরিক আনুগত্য ও অকৃত্রিম ভক্তির পরিমাপে। গুরুর কাছ থেকে লাভ করা শিক্ষা, পথ নির্দেশ, অনুপ্রেরণার প্রতিদান স্বরূপ জীবনের চাইতেও বড় হল ভক্তি। অন্যদিকে গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ শিষ্য দেবেন তাঁর সর্বস্ব —এ যেমন প্রচলিত বিধান তেমনি গুরুও প্রসাদ করে সেই সর্বস্বই ফিরিয়ে দেবেন শিষ্যকে এও প্রথাসম্মত। উদাহরণ স্বরূপ, ছত্রপতি শিবাজী গুরু রামদাসের শ্রীপদে সমার্পণ করেছিলেন তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্য, গুরু রামদাস তা গ্রহণ করেও লোকহিতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শিবাজির হাতে। এখানে দেওয়া এবং নেওয়ার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই ঠিকই কিন্তু ওই সম্প্রদানের পিছনে যে শক্তি কাজ করেছিল তা হল ভক্তি।

ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে এক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে— অভ্যন্তর থেকে প্রশ্ন এল, কি দিতে পারবে? মহেন্দ্র দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলেন, জীবন, জীবন দিতে পারবেন তিনি। কিন্তু পুনরায় সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল, জীবন তো তুচ্ছ! আর কি দিতে পারবে। মহেন্দ্র ভেবে পান না জীবনের থেকে বড় আর কি দেওয়ার থাকতে পারে। তাই তিনিই জানতে চাইলেন, তবে কি দিতে হবে? উত্তর এল— ভক্তি।

গুরুভক্তির আরও একটি উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন পদ্মপাদন। জগদগুরু আদি শঙ্করাচার্য তাঁর এই অন্যতম প্রধান শিষ্যকে পূর্বভারতে পুরীধামের গোবর্ধন মঠের প্রথম প্রধান করেছিলেন। কথিত আছে বহু সাধনা ও কঠোর তপস্যায় এবং এক একনিষ্ঠ ব্যাধের সাহায্যে পদ্মপাদন বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারকে স্বীয় শক্তিতে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু বিষ্ণুর শর্ত ছিল যে পদ্মপাদন তাঁর সারা জীবনে কেবলমাত্র একবারই যে কোন প্রয়োজনে সেই অমোঘ শক্তিকে কাজে লাগাবেন। তারপর পদ্মপাদন ওই শক্তিকে আর নিজের কাছে রাখতে পারবেন না।

এদিকে এক তন্ত্রসাধন কাপালিকের যে ভাবেই হোক বদ্ধ ধারণা হয়েছিল যে এক হাজার মানুষের শবদেহের উপর সাধনা করতে পারলে সে নাকি স্বশরীরে কৈলাসে যেতে পারবে। তাই যখন তার ৯৯৯ জনকে হত্যা করে সাধনা শেষ হয়ে

গেল তখন তার মাথায় ঢুকল যে, শেষ ব্যক্তি হবেন এমন একজন যিনি বহু জ্ঞানে জ্ঞানী, বহু সাধনার সাধক এবং বহু পুণ্যের পুণ্যাত্মা। বলা বাহুল্য তখনকার দিনে আদি শঙ্করে চাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি তার কাছে আর কেউ বিবেচিত হতে পারলেন না। একদিন শিষ্যরা যেই দূরে গেছেন সেই ফাঁকে কাপালিক শঙ্করাচার্যের কাছে গিয়ে তার মনের কথা খুলে বলে যেই শঙ্করাচার্যের দিকে ত্রিশূল তুলেছে দূর থেকে সে দৃশ্য দেখে পদ্মপাদন সেই মহাশক্তি প্রয়োগ করলেন। একটি তীব্র দ্যুতি নিমেষে কাপালিকের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলল।

আদি জগদগুরু যখন বললেন, পদ্মপাদন, এ তুমি কি করলে? তোমার সারা জীবনের সাধনার সম্পদ নিঃশেষ করে ফেললে? পদ্মপাদন পরম তৃপ্তি ভরে আচার্যের পদার্ঘ মাথায় তুলে নিয়ে সবিনয়ে বললেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদই তো গুরুদক্ষিণার যোগ্য।'

কাহিনীটি হয়ত রূপক, হয়ত সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু এর মধ্যে গুরুভক্তির যে আদর্শের কথা বলা হয়েছে শিক্ষনীয় বিষয় হল সেটাই। এই যে গুরুদক্ষিণা এ কেবল ব্যক্তি গুরুর জীবন রক্ষা তথা বিশ্বমানবতা রক্ষাও বটে। ধর্ম, দেশ, জাতি রক্ষার জন্য পদ্মপাদনের আজন্ম সাধনালব্ধ সম্পদের এই যে সমর্পণ এর উৎসই হল ভক্তি।

রাষ্ট্রভক্তিও মানুষকে যে কতখানি সমর্পণমুখী করে ভামাশাহ তার এক উজ্জ্বলতত্বম স্বাক্ষর। মহারাণা প্রতাপ সিংহ রাজ্যহারা হয়ে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ধীরে ধীরে অর্থবলের অভাবে অস্ত্রবল, সৈন্যবল, সীমিত হয়ে যাচ্ছে। নূতন করে সম্পদ সংগ্রহ করা তথা নূতন আক্রমণে আকবরকে পরাভূত করে চিতোর পুনরুদ্ধারের সংকল্প প্রায় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। কোন দিকেই মহারাণার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার স্বপ্ন চিরতরে অস্তমিত প্রায়। এমনই এক ঘোর দুঃসময়ে এগিয়ে এলেন এই দেশভক্ত বৃদ্ধ। সবিনয়ে রাণা প্রতাপের সামনে হাতজোড় করে বললেন, মহারাণা, আপনার অধীনে চাকরি করার সময় আপনি আোমাকে যে বিত্ত দিয়েছিলেন তারই একটি অংশ আমার কাছে সঞ্চিত রয়েছে। আজ মাতৃভূমির এই ঘোর দুঃসময়েই যদি তা কাজে না লাগে তবে সে অর্থেরই বা মূল্য কি আর দেশের সন্তান হিসাবে আমিই বা কি করতে পারলাম? আপনি একে দান বলে মনে করবেন না, মাতৃভূমির প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমর্পণ। এই অর্থ নিয়ে আপনি আবার সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করে আপনার মহান বীরত্বে মাতৃভূমির স্বাধঈনতা ও সম্মান রক্ষা করুন। ভামাশাহ'র

এই যে সর্বস্ব অর্পণ এও এক ধরণের গুরুদক্ষিণা। এখানে গুরু তাঁর মাতৃভূমি তথা মেবারের স্বাধীনতার প্রতীক গৈরিক পতাকা।

রাণা প্রতাপ ভামাশাহ'র এ শ্রদ্ধার্ঘ ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। ভামাশাহ প্রতাপের হাতে তুলে দিলেন বিপুল পরিমাণ অর্থ যা ছিল ওই বৃদ্ধের সারা জীবনের সঞ্চিত সম্বল। মহারাণাও নূতন উদ্যমে, নূতন আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্রসেবায় সংঘ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্বেচ্ছায় এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ভারত রাষ্ট্র তথা ভারতীয় সমাজের সেবাব্রতে আত্মনিয়োজিত। দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা সঙ্ঘের প্রতিটি শাখায় নিত্যদিন শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই সমাজ সেবার প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে এক সুপ্রাচীন ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সংস্কার পদ্ধতির মাধ্যমে। ঠিক যেমন এক সময় আশ্রমে, গুরুগৃহে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। গুরুগৃহ প্রাঙ্গণের মত সঙ্ঘের শাখাগুলিতে এই প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সঙ্ঘের সামনে তাই প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের মধ্যে অনুপ্রেরণা সঞ্চারের নিমিত্ত প্রয়োজন কোন আদর্শ প্রতীকের যার অন্তর্নিহিত শক্তির সঞ্চার হবে প্রত্যেকের মধ্যে। কারণ প্রতীক ছাড়া শক্তির বহিঃপ্রকাশ কষ্টকল্পনীয়। যেমন বিদ্যুতের শক্তি আছে, কিন্তু যতক্ষণ তা কোন আলো না জ্বালাচ্ছে বা অন্য কোন কাজ করছে ততক্ষণ সে শক্তি অপ্রকাশ্য। ঈশ্বরের শক্তি, আশীর্বাদ, অনুপ্রেরণা লাভের জন্যও দরকার তাঁর প্রতিমূর্তি বা প্রতীকের। এমন কি নিরাকারবাদীরাও প্রতীক ছাড়া ঈশ্বরে সাধনা করতে পারেন না। কোন না কোন প্রতীককে সামনে বা মানসপটে রাখেন। খৃষ্টান ও ইসলামীরা তো নিরাকারবাদী হয়েও আদমকে ঈশ্বরেরই অনুরূপ আকৃতি বলে মনে করেন. অতএব অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী শক্তির উৎস যে গুরু তাঁরও কোন না কোন প্রতীক থাকা বাঞ্ছনীয় একথা সঙ্ঘও সময়ে অনুভবব করে এবং তখনই সঙ্ঘের সামনে প্রশ্ন ওঠে সেই প্রতীক বা গুরু হবেন কে?

যে মহামুনি দধিচী আপন অস্থি ইন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে লোকরক্ষা করেছিলেন তাঁকে বা তাঁর প্রতিমূর্তিকে সঙ্ঘ তথা সমগ্র ভারতীয় সমাজের গুরু হিসাবে গ্রহণ ও বরণ করা যেত। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীকেও গুরু মানা যেত। কারণ এই সমস্ত ব্যক্তি মানব হিসাবে যেমন বহুগুণসম্পন্ন এবং বহুজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন সেই সঙ্গে ছিলেন অজাতশত্রু, সমাজসেবক ও আদর্শ সমাজ সংস্কারক। শ্রীগুরুজী তো সঙ্ঘে আসার আগে থেকেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের কাছে শ্রদ্ধেয় 'গুরুজী' হিসাবেই স্বীকৃত ছিলেন।

কিন্তু সঙ্ঘ কোন ব্যক্তিকে গুরু হিসাবে বরণ না করে গ্রহণ করেছে ভারতের শাশ্বত সনাতন ত্যাগের মহিমাময় প্রতীক গৈরিক পতাকাকে। অনেকের ধারণা সঙ্ঘের যিনি প্রধান হন তিনিই তখন হন সঙ্ঘের গুরু। ডাক্তার হেডগেওয়ার দেহ রাখার পর লোকেরা তাই জানতে চেয়েছিলেন, সঙ্ঘের গুরু কে হলেন? শ্রীগুরুজীর লোকান্তর হতেও সেই একই প্রশ্ন উঠেছিল অনেকের মনে। বর্তমান সরসঙ্ঘচালকের পরে গুরু কে হবেন এমন প্রশ্নও কিছু কম করেন না লোকেরা। এটা নিছকই অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তিজনিত ব্যাপার।

সঙ্ঘ একটি প্রতিষ্ঠান হলেও তা হিন্দু জাতিরই সংস্থাগত প্রতীক। ভারতাত্মার মৌলিকত্বের সঙ্গে সঙ্ঘ-আদর্শের মৌলিকত্বের কোনই পার্থক্য নেই। তাছাড়া সঙ্ঘ শ্রদ্ধাবাদে বিশ্বাসী হলেও ব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী নয়। এইসব কারণে সঙ্ঘ গুরু হিসাবে তাঁকেই বরণ করেছে যা ভারতাত্মা তথা বিশ্বমানবতার মধ্যে শক্তি সঞ্চারকারী তথা পূর্ণত্বের প্রতিমূর্তি।

বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যে তাঁর মহত্ব ও গুণকর্মের দ্বারা সংস্থাগত গুরু কিম্বা রাষ্ট্রগুরু হতে পারেন না এমন নয়। তার উপর তেমন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ভারতমাতা অন্ততঃ কখনও বন্ধ্যা হয়ে থাকেননি। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন ইতিহাসের এমন কোন কালখণ্ড নেই যখন কোন না কোন মহাপুরুষ ভারত মায়ের কোল আলো করে আবির্ভূত হননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে ব্যক্তির স্বগুণতায় নির্গুণের কণামাত্রও স্পর্শ করবে না এমন ভাবা ঠিক নয়। তাছাড়া ব্যক্তি যদি তেমন সদ্‌গুণসম্পন্ন হনও তাহলেও সমাজ তথা জাতির সমস্ত মানুষের কাছেই যে তিনি আশা, আকাঙ্খা ও প্রেরণার একমাত্র কেন্দ্রস্থল হবেনই এমন তো নাও হতে পারে। তার থেকেও বড় কথা ব্যক্তি সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় হলেও অবিনশ্বর নয়। এমন কি ঈশ্বরে অবতার হলেও তো তাঁকে যুগে যুগে নশ্বর দেহ নিয়েই আবির্ভূত হতে হয়! অন্যদিকে সমাজ, রাষ্ট্র তথা জাতি হল চিরন্তন সত্ত্বা। সুতরাং হিন্দু সমাজ বা জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ কোন সংস্থার ক্ষেত্রে তার প্রেরণাকেন্দ্রও হওয়া উচিত চিরন্তন ও সনাতন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাই অনেক চিন্তা করে, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুর সঙ্গে ত্যাগের আদর্শের সমন্বয় সাধনকারী পূর্ণ গৈরিক ধ্বজকেই গুরু হিসাবে বরণ করে নিয়েছে এবং প্রতি বছর আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা ব্যাস পূর্ণিমায় প্রথাগত গুরুপূজার মাধ্যমে সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক তাঁদের অন্তরের 'ভক্তি' নিবেদন করে মনুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদকে সমর্পণ করে থাকেন গুরুদক্ষিণার পরম অর্ঘ্য হিসাবে। সঙ্ঘের শাখায়

প্রতিদিন গৈরিক পতাকার নিচে আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের পর বৎসরান্তে নিবেদিত গুরুদক্ষিণারূপী এই সমর্পণ একটি অতি উত্তম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে গড়ে ওঠে দেশভক্তি তথা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের পরম মানসিকতা। সঙ্ঘের মৌলিক লক্ষ্য এটাই।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা হিসাবে চিহ্নিত হবার কারণ প্রথমতঃ পূর্ণিমা হল পূর্ণত্বের প্রতীক, তার উপর সেই সুদূর কালে আষাঢ়ী পূর্ণিমার এই পুণ্য তিথিতেই সনাতন ভারতের অধ্যাত্মভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন নিখিল জ্ঞানের ধারক ও প্রচারক, বেদবিন্যাসকর্তা, মহাভারত প্রণেতা ও পুরাণ প্রবক্তা মহর্ষি ব্যাসদেব। ব্যাসদেব চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমষ্টি ও রাষ্ট্রজীবন গড়ে উঠুক। মহর্ষি আমাদের জগদ্‌গুরু। তাই ব্যাস পূর্ণিমাই গুরুপূর্ণিমা হিসাবে স্বীকৃত এবং এই তিথিতেই গুরুপূজার মাধ্যমে এই পূর্ণিমার রূপায়ণ সনাতন ভারতের প্রচলিত রীতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শঙ্করী প্রসাদ বসু — ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

কে আর মালকানী — দত্তোপন্ত ঠেংড়ী

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা বিভাগ

জাতীয় পতাকা সমিতির প্রতিবেদন
সভাপতি—সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি

মহোদয়,

১৯৩১ সালের ২রা এপ্রিল করাচিতে সারা ভারত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠকে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবে ৭ জনের এক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বর্তমান পতাকা সম্বন্ধে যে সমস্ত আপত্তি উঠেছে তা খতিয়ে দেখে কংগ্রেসের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য একটি পাতাকার স্বরূপ নির্ণয় করার ভার ঐ কমিটির উপর দেওয়া হয়েছিল।

কমিটির একথা জানা ছিল যে ঐতিহ্যগত এবং ব্যবহারিক দিক থেকে বর্তমান পতাকা যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও পতাকার তিনটি রং সম্বন্ধে আপত্তি তুলে বলা হলো যে তাতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। অতএব কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক কমিটি নিয়োগ করে ঐ সকল আপত্তির তদন্ত সাপেক্ষে কংগ্রেসের স্বীকৃতির জন্য এক নূতন পতাকার সুপারিশ করার ভার অর্পণ করেন। কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয় ও ১৯৩১ সালের ৩১ জুলাইয়ের পূর্বে তাদের সুপারিশ কার্যকরী সমিতির কাছে পেশ করতে বলা হয়—

১। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল
২। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
৩। মাষ্টার তারা সিং
৪। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
৫। অধ্যক্ষ ডি.পি.কালেলকর
৬। ডঃ এন.এস.হার্ডিকর
৭। ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া (আহ্বায়ক)

তারপর কিছু অল্পদিনের মধ্যেই কিছু প্রশ্নমালা তৈরী করে কমিটি ব্যাপকভাবে সকলের কাছে পাঠালেন।

১। আপনার মতে, আপনার মহলের কোন শ্রেণী বা কিছু লোকের মতানুসারে বর্তমান জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে এমন কোন মতানৈক্য রয়েছে যা কমিটির নজরে আসা আপনি প্রয়োজন মনে করেন?
২। জাতীয় পতাকাকে অধিক জনপ্রিয় করা কোন বিশেষ সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আপনি দিতে পারেন কি?
৩। বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় পতাকার স্বরূপ নির্বাচনে কোন ত্রুটি এবং বিচ্যুতি থাকার ফলে সেগুলি এখন সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে কি?

বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়; সংবাদপত্রে

বিজ্ঞপ্তি জারি করে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের কেন্দ্রীয় কার্যলয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রিত করা হয়। ঐ প্রশ্নমালার জবাবে অন্ধ্র, বিহার, বোম্বাইনগর, কর্ণাটক, সিন্ধু, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ সহ ৮ টি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, ৫০ জন নাগরিক এবং কেন্দ্রীয় শিখলীগ নিজ নিজ মতামত লিখিতভাবে পাঠান। মতামত জানানোর শেষ তারিখ ধার্য করা হয়েছিল ১লা জুন। কিন্তু সর্বসাধারণের মতামত ৫ই জুলাই পর্যন্ত গৃহীত হয়।

ঐ বছর ৭ই জুলাই থেকে বোম্বাইয়ের কার্যকরী সমিতির বৈঠক চলাকালেই ৮ ও ৯ জুলাই দুটি বৈঠক রাখা হলো পতাকা কমিটির জন্য। প্রথম দিনের বৈঠকে সব সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পরের দিনের বৈঠকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অনুপস্থিত থাকেন। এই উভয় বৈঠকের সর্দার শার্দুল সিংয়ের উপস্থিতিতে কমিটি বিশেষভাবে উপকৃত হয়। আমাদের অভিমত ছিল যে কারও মৌখিক সাক্ষাৎ গ্রহণ অনাবশ্যক।

সকলেরই মনে হয়েছিল যে কমিটির কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং সূক্ষ্ম। কমিটির সদস্য এবং নাগরিকদের মধ্যে ঐক্যমত ছিল যে পতাকার রংয়ে কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ না থাকা উচিত। একথা সত্য যে কংগ্রেস পতাকার রংয়ের কোনরকম সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা কখনও স্বীকার করেনি, কিন্তু এ কথাও সত্য যে মূলতঃ এই পতাকার চিন্তা যখন করা হয়েছিল, লাল এবং সবুজ এই দুই রংয়ের ভিত্তি ছিল হিন্দু ও মুসলমান। আর তারপর সাদা রং নেওয়া হয় অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের কথা ভেবে।

শিখ সম্প্রদায় শুরু থেকেই রংয়ের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল। তাই ১৯২৯ সালে ঐ সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঐ পতাকায় তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রতীক স্বরূপ কোন রং সংযোজন অথবা সাম্প্রদায়িকতা শূন্য পতাকা তৈরীর দাবী জানায়। তখন থেকেই এই পতাকা সম্বন্ধে কিছু কিছু আপত্তি উঠতে থাকে। আর তাই ঐ কমিটিকে সবরকম আপত্তি যাচাই করে কংগ্রেস দলের গ্রহণযোগ্য একটি পতাকার স্বরূপ নির্দেশ করার কাজ অর্পণ করা হয়।

কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে পৌছায় যে পতাকার রঙে কোনরকম সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে সকল লোক বা সম্প্রদায় পতাকার রঙ সম্বন্ধে আপত্তি তুলেছে তার সমাধান কি কেবল ঘোষণা দ্বারাই সম্ভব না ঘোষণার পরেও ঐ সকল রঙের অস্তিত্ব রাখলে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে? এ কথা সত্য যে ঐ রঙগুলির পর কিছু শিল্পগত এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কমিটির এই অনুভব হয় যে সমাজের লোকের মনে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে প্রচলিত

এই রঙের সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জড়িত রয়েছে। কাজেই এই সকল রঙের সম্পর্কে সৃষ্ট মনোভাব দূর করা কঠিন কাজ হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত রঙের বদল অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে উঠে। কিন্তু এইরকম পরিবর্তনের কথা ভাবতে গিয়ে কমিটির মনে ধারণা হল সারাদেশে বর্তমান পতাকার উপর কতটুকু ভাবানুভূতি জন্মেছে তার তথ্যানুসন্ধান করা দরকার। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলা হলো যে এই পাতাকাকে সামনে রেখেই একদিন অসহযোগ আন্দোলনের চিন্তাধারা জন্ম নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করেছিল। এই পতাকা নিয়েই নাগপুরে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করেছিল এবং অবশেষে ১৯৩১ সালে মহান অহিংসা সত্যাগ্রহের লড়াই অতি তীব্রভাবে চালানো হয়েছিল এই পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। এই যুক্তি অকাট্য হলেও একথা মনে রাখা দরকার যে গত দশ বছরে এই পতাকার প্রতি যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছে তা কোন রঙ বিশেষের বা কোন প্রতীককে কেন্দ্র না করেই জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিল। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও ত্যাগের প্রতীক ছিল এই পতাকা। এইভাবেই পতাকা তৈরী হয়েছিল যে জাতীয় পতাকা সর্বদাই রাষ্ট্রের গঠনমূলক কাজের বাহক এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। তা যে কোন রঙের বা রকমের হোক না কেন। তাই দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জন্য এই পতাকা এক পরম প্রিয় ও পবিত্র বস্তু। এখন এই পতাকাকে এক নূতন প্রতীকে পরিবর্তিত করার কথা বিচার করা এক দুরূহ কাজ। কারণ আমাদের অতীত ত্যাগ ও সাফল্যের সঙ্গে এর কোন যোগসূত্রই নেই।

আবার এই কমিটি আরও বিচার করল যে ঐ পতাকা থেকে চরকা সরিয়ে দিলে তা বুলগেরিয়ার জাতীয় পতাকার অনুরূপ হয়ে যায়। আর সাদা রঙ মাঝখানে রাখলে তা ইরান দেশের পতাকার ন্যায় দেখায়। তাই সাম্প্রদায়িক চিন্তা ছাড়াও বর্তমান রঙের পতাকা দুই দেশের পতাকার অনুরূপ হওয়ার ফলে ঐ পতাকার স্বীকৃতি দেওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠল। তেরঙ্গা পতাকার উপর চরকা রাখার পক্ষে এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে আমাদের পতাকা অন্য দেশের চেয়ে ভিন্ন। ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু একথাও ঠিক, সর্বসাধারণের জানা রয়েছে চরকাহীন তেরঙা পতাকা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে জাতীয় পতাকা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এইসব কথা মনে রেখেই এক নূতন পতাকার স্বরূপ নির্ণয়কালে যাতে সবরকম ভ্রান্তির সম্ভাবনার হাত থেকে মুক্ত থাকা যায় তাও লক্ষ্য রাখতে হলো। এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হল যে সেই সঙ্গে এরকম সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙ ও প্রতীক গ্রহণ করা উচিত যা পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখে।

এখন কমিটির জাতীয় পতাকার স্বরূপ নির্ণয়, তার উপযুক্ত রঙ ও প্রতীক নির্বাচন

করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আমাদের মনে হয় ঐ পতাকা এক পৃথক, স্পষ্ট, শিল্পমণ্ডিত, প্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার দোষমুক্ত হওয়া উচিত। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবে স্থির হয় যে জাতীয় পতাকা এক রঙ বিশিষ্ট হবে এবং তার উপর একাধিক রঙ সম্বলিত একটি চিহ্ন অঙ্কিত থাকবে। যদি একই রং সমস্ত ভারতবাসীর গ্রহণীয় বলে মনে হয়, যা সবচেয়ে ভিন্ন, স্পষ্ট এবং দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, তবে তা হলো গৈরিক রঙের পতাকা। কাজেই সবাই একই মত পোষণ করে স্থির করলেন যে পতাকা গৈরিক রঙের হোক এবং এর উপর প্রতীক হোক ভিন্ন রঙের। এই প্রতীক চরকাই রাখা হোক বলে সবাই মত প্রকাশ করলেন। তবে লাঙ্গল, পদ্মফুল প্রভৃতি প্রতীক সম্বন্ধেও কেউ কেউ নিজেদের মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু চরকাই সত্যিকারের প্রতীক যাকে কেন্দ্র করে গত দশ বছর ধরে জাতীয় আন্দোলন পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লাভ করেছে। আর তাই অন্য প্রতীক গ্রহণ করে চরকার গুরুত্ব কমানো অনুচিত বিবেচিত হল। আমাদের লক্ষ্য প্রতীকের রঙও স্থির করা। কমিটির সিদ্ধান্ত হল চরকার রঙ নীল রাখা দরকার। অতএব জাতীয় পতাকার রঙ সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো তা গৈরিক রঙের হোক; আর তার বাঁ দিকের এক চতুর্থাংশে নীল রঙের চরকা অঙ্কিত থাকুক। চরকার মূলটা ধ্বজ-দণ্ডের দিকে রাখা হোক ও সেই সঙ্গে লহর তুলার জন্য পতাকার অনুপাত হোক ৩ ঃ ৬।

(জনগণের প্রতিনিধি বল্লভ ভাই প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ, তারা সিং, জওহরলাল নেহেরু, ডি.পি.কালেলকর, এন.এস.হার্ডিকর, বি. পট্টভি সীতারামাইয়া (আহ্বায়ক), জয়রাম দৌলতরাম, সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এম.এন.কুলকার্ণী কর্তৃক কর্ণাটিক প্রিন্টিং প্রেস, ৩১৮এ, ঠাকুরদ্বার, বোম্বাই থেকে মুদ্রিত)।

দৈনন্দিন শাখায় ব্যবহৃত পতাকার মাপ
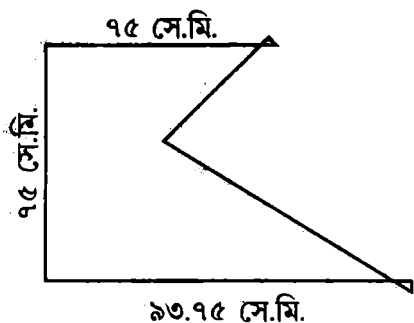
১। ধ্বজ দণ্ড ২.৫ মিটার

২। ধ্বজ মণ্ডলের ত্রিভুজ ১০ সেমি

মহর্ষি বেদব্যাস ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত শ্রেষ্ঠগুণ নির্ধারিত করেছেন এবং তার মহান আদর্শকে চিত্রিত করে সমাজের সামনে রেখেছেন। চিন্তাধারা তথা প্রত্যক্ষ ব্যবহার এর সমন্বয় করে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নয় সম্পূর্ণ মানবজাতির মার্গদর্শন করেছেন। এই জন্যই বেদব্যাস সম্পূর্ণ বিশ্বের গুরুরূপে পূজিত এবং তাকে 'ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং'— বলা হয়েছে। যাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মার্গদর্শক রূপে মেনেছি এবং গুরু রূপে গ্রহণ করেছি তারই পূজা আষাঢ় পূর্ণিমার দিনে আমরা করে থাকি। তার সম্মুখে অর্পণ করে থাকি। তাঁর সম্মুখে আত্মনিবেদন করে আগামী বৎসরের জন্য আশীর্বাদ কামনা করি এবং নিজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করি।

ব্যক্তিনিষ্ঠা নয় তত্ত্বনিষ্ঠা

শাস্ত্রে গুরুর মহিমা বলা হয়েছে। গুরুকে ভগবানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আমাদের ঋষিমুনিরা গুরুর গুণগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত গুণ একজন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া খুবই কঠিন। মনুষ্যমাত্রই পতনশীল। সেজন্য সঙ্ঘের মধ্যে আমরা ভাবনা, চিহ্ন, লক্ষণ অথবা প্রতীককে গুরু মানি।

তেজ জ্ঞান এবং ত্যাগের প্রতীক

আমাদের সমাজজীবনে যজ্ঞের গুরুত্ব ছিল। যজ্ঞ শব্দের অনেক অর্থ আছে। ব্যক্তিগত জীবনকে সমর্পিত করে সমষ্টি জীবনকে যে পরিপুষ্ট করে সেই প্রচেষ্টাকে যজ্ঞ বলা হয়েছে। সদ্‌গুণ রূপ অগ্নিতে অযোগ্য অনিষ্ট অহিতকর ক্রিয়াকে হোমে অর্পণ করাই যজ্ঞ। শ্রদ্ধাময়, ত্যাগময়, সেবাময়, তপস্যাময় জীবন ব্যাতীত করাই যজ্ঞ। যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি। অগ্নির প্রতীক জ্বালা। এবং জ্বালার প্রতিরূপ হচ্ছে আমাদের ভগোয়া ধ্বজ।

অজ্ঞানের প্রতীক অন্ধকার এবং জ্ঞানের প্রতীক সূর্য। পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে সূর্যনারায়ণ রথে আরূঢ় হয়ে আসেন। তাঁর রথে সাতটি ঘোড়া আছে। তাঁর আগমনের অনেক আগে তাঁর রথের গৈরিক ধ্বজা দেখা দেয়। এই ধ্বজকেই আমরা আমাদের সমাজের পরম শ্রদ্ধেয় প্রতীক মেনেছি। এটা ভগবানের ধ্বজ সেইজন্যই আমরা তাকে ভগবদ্ ধ্বজ বলি। ওটাই পরে ভগবা ধ্বজ হয়েছে।

এই আমাদের গুরু

এইভাবে সন্ন্যাসীরা যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যা সূর্য ভগবানের আগমন চিহ্ন

হিসাবে আছে, অগ্নিশিখার প্রতিকৃতি সেই ভগোয়া ধ্বজ আমাদের প্রেরণাস্থান। তার মাধ্যমেই আমাদের রাষ্ট্রের আত্মা প্রকট হয়। আমাদের দেশের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করছে। এই সব কারণগুলির জন্য আমরা এই ধ্বজের পূজন করে থাকি অন্য কোন ব্যক্তির নয়।

ইতিহাসের সাক্ষীরূপ

এই পবিত্র পতাকাকে আমরা আমাদের সামনে গুরু হিসেবে রেখেছি তার ফলে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাজ করেছি যে সমস্ত বীরত্ব প্রকাশ করেছি সে সমস্ত তেজস্বী জীবন আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। জগৎগুরুর স্থান লাভ করার আবশ্যক সমস্ত গুণাবলী আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। এর সেবার জন্য সব কিছু অর্পণ করার প্রয়োজন আছে। নিজের জীবনকে যজ্ঞরূপ জেনে তাতে নিজেকে অর্পণ করার উৎসাহ, প্রেরণা তথা মার্গদর্শন প্রদান করে। এইভাবে যজ্ঞশিখার প্রতীক আত্মসমর্পণের দিশারী পবিত্র ধ্বজই আমাদের আদর্শ। এইজন্য আমরা তার সামনে পূজন করে সর্বস্ব অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকি।

শিবো ভূবা শিবং যজেৎ

আমরা যে গুরুর পূজা করি তার গুণও নিজের জীবনে নির্মাণ করার চেষ্টা করবো। যদি সেই গুণগুলো নিজ জীবনে অর্জন করতে না পারি তবে কর্তব্যপূর্তি হবে না। যে নিজের গুরুর সাথে অধিকাধিক একাত্ম এবং একরূপ হতে পারবে সেই তার বাস্তবিক পূজা করতে পারবে অন্য কেউ না। আমাদের এখানে তো বলা হয়েছে যে পূজা করতে করতে স্বয়ংই শিব অথবা ঈশ্বর হয়ে যাওয়া উচিত। সর্বপ্রথম আমাদের গুরুর শ্রেষ্ঠতা যার সামনে সমস্ত বিশ্বে লঘু মনে হবে আমাদের জীবনে সৃষ্টি করতে হবে।

আমাদের দৃঢ় নিশ্চয় হতে হবে। যেখানে যেখানে আমরা পদার্পণ করব অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার দরকার সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কেবল মাত্র এগিয়ে যাওয়াই নয় উপরন্তু সেখানে একটি আদর্শ স্থাপন করব। এটা ঠিক করেই সেই অনুসার নিজের জীবন গঠন করা আজ অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রকৃত পূজা

পূজার অর্থ কেবলমাত্র সুগন্ধি ফুল দেওয়া নয়। পূজার প্রকৃত অর্থ সমর্পণের ভাবকে জাগিয়ে তোলা। কিন্তু তার বাহ্যিক রূপ কি হবে? নিজের জীবনে যে দ্রব্য ভীষণ প্রয়োজনীয় তা উৎসর্গ করাই সমর্পণের বাহ্যিক স্বরূপ। ব্যবহারিক জগতে আমাদের অর্থের প্রয়োজন হয়, সুখ, ঐশ্বর্য এবং অন্যান্য অনেক উপভোগের বস্তু সব কিছুই অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়। সেই অর্থই পর্যাপ্ত পরিমাণে আরাধ্য দেবতার সামনে নিবেদন করা সত্যকারের সমর্পণ। সেটাই বাস্তবিক পূজা। এই বস্তু সমর্পণ সমস্ত জীবনের সমর্পণের প্রতীক মাত্র, সমর্পণের প্রারম্ভমাত্র। আমি আমার শেষ সামর্থ পর্যন্ত দিতে পেরেছি, এমন তৃপ্তি মনে আসা চাই। কেউ এসে আমার কাছে আগ্রহ করল, কেউ বা দর কষাকষি করে আমার দেয় অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল সেটা কিন্তু সমর্পণ নয়। আমার কাছে অনেক অর্থ আছে সুতরাং তার থেকে সামান্য কিছু দিয়ে দেওয়া যাক এই ধরণের তুচ্ছতার সঙ্গে যে ধন দেওয়া হয় তা কখনই সমর্পণ নয়।

শ্রদ্ধার সঙ্গে, কষ্ট করে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যা দেওয়া হয় তাই প্রকৃত সমর্পণ। গুরু দক্ষিণা কত দিতে হবে তার কোন নিশ্চিত অঙ্ক নেই। চাঁদা, সাহায্য বা দানের সাথে এর কোন তুলনাই চলে না। এখানে কোনওপ্রকার বাধ্য বাধকতাও নেই। কে কত গুরুদক্ষিণা করবে তার প্রত্যেকের শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। একটা পয়সাও চলতে পারে, আমি কত দিচ্ছি গুরুত্ব তার নয়, আমি কত চেষ্টা করে কি ভাবনায় তা দিচ্ছি গুরুত্ব তার মধ্যেই আছে।

সঠিক ধারণার সাথে সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সমর্পণ করাই আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে এ কেবলমাত্র সমাধানের প্রতীক মাত্র, কর্তব্যের সমাপ্তি নয়। পাণ্ডাকে একশো টাকা দিলাম, পাণ্ডা বলে দিল ঠিক আছে তোমার পূর্বপুরুষ স্বর্গে যাবে তা এখানে চলবে না। রাষ্ট্রের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে, নিজের শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে এ কেবল তার উপলক্ষ্য মাত্র।

রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমি এই সংগঠনের সদস্য হয়েছি, আমার জীবনের কিছু অংশ নিত্য নিয়মিত রূপে রাষ্ট্রদেবতার চরণে অর্পণ করতে হবে। আমাদের মেনে নিতে হবে এই যে সময় আমি দিয়েছি তা আমার নয়, যদি কখনও রাষ্ট্রদেবতার জন্য নির্ধারিত সময় নিজের স্বার্থে ব্যয় করি, তবে তা চুরি হিসাবেই গণ্য হবে, এই

পদ্ধতি অর্থাৎ শাখা পদ্ধতি।

সত্যকার স্বার্থ

মনুষ্য জীবন সমাজের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমের বিজ্ঞানীগণ বলেন যদি কোন ব্যক্তিকে ছয় সপ্তাহ একলা রেখে দেওয়া যায় তবে সে পাগল হয়ে যাবে। নিজের স্বার্থের জন্য না হোক সমাজকে সুস্থিতির মধ্যে রাখতে হবে।

প্রসন্নচিত্তে পুণ্যপথে চলতে থাকো

প্রসন্ন চিত্তে পুণ্যপথে চলার একমাত্র উপায় হল আমরা আমাদের হৃদয়কে বড় করব, চিন্তা করব অন্যের সুখই আমার সুখ। আমি নিজে হয়তো অনেক কষ্টের মধ্যে আছি কিন্তু প্রতিবেশী যদি সুখী থাকে তবে তাকে সুখী দেখে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত। এ একটি চিন্তাধারা, অন্যের সুখে আনন্দিত হয়ে সেই সুখী ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার প্রয়াস প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে হওয়া দরকার, এই উপায় দ্বারা আমরা ঈর্ষা, দ্বেষ ও প্রতিযোগিতার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি।

ভগবা ধ্বজ আমাদের আদর্শ

আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে পরম পবিত্র ভগবা ধ্বজই আমার আদর্শ, গুরু তথা আমাদের ধ্যেয়। গুরুর পূজার জন্য সাধনরূপ সংঘ কাজের প্রতি আমার পূর্ণ নিষ্ঠা রেখে আমার সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাথে আনন্দিত চিত্তে কাজ করব। আমি সর্বদা নিজেকে কার্যমগ্ন রেখে এই মহৎকাজের পূর্তির জন্য জীবনের সমস্তশক্তিকে নিয়োজিত করব।

আমাদের কাজের এতই প্রগতি হবে যাতে পূর্বে যে ধ্বজকে জগতগুরুর আসনে বসান হত আবার সমস্ত জগত যেন তার সামনে নতমস্তক হয়ে যায়, এর চরণে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে এর পূজা করতে বাধ্য হয়। এই আকাঙ্খা এই প্রেরণা হৃদয়ে উৎপন্ন হয়।

গুরুদক্ষিণা সম্পর্কে আগ্রহ

গুরুদক্ষিণার বিচার কেবলমাত্র অর্থের মাপকাঠিতে করা উচিত নয়। প্রত্যক্ষরূপে পূজন করার জন্য আগ্রহ করা দরকার। দক্ষিণা যেন চাঁদার মত না হয়ে যায়। সর্বাধিক সংখ্যক স্বয়ংসেবক ধ্বজ পূজন করছে, দক্ষিণা সমর্পণ করছে এমনই আগ্রহ থাকার

দরকার। এ কাজ আমার, এর জন্য আমাকে কষ্ট করতে হবে, কিছু দিতে হবে এই মানসিকতা স্বয়ংসেবকদের মধ্যে নির্মাণ হোক এমনই প্রয়াস হওয়া দরকার। অর্থ সংগ্রহ করা অর্থ সঞ্চয় করা, আমাদের কাজ নয়, কাজের হেতুও নয়—আমাদের কাজের এ এক স্বাভাবিক পরিণাম। তন মন ধন দ্বারা আমি আমার কাজ করব এই প্রেরণাই আমাদের কাজের হেতু, আধার, প্রথম দিনই কোন ব্যক্তি সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারে না, এই ভাবনাকে ধীরে ধীরে বিকাশ করতে হবে। গুরুদক্ষিণা বাড়াবার জন্য বেশি জবরদস্তি বা জোর করা কখনই উচিত নয়। কারো মনে দুঃখ দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। স্বয়ংসেবকদের মনের প্রসন্নতা কখনই ভঙ্গ করা উচিত নয়।

উভয়পক্ষের নানাবিধ দীপ্তিমান্ ধ্বজদণ্ডসকল সমুত্থিত হইয়াছে; কাঞ্চন মণিভূষিত সহস্র-সহস্র ধ্বজপটসকল জ্বলন্ত অনলের ন্যায়, অমরাবতীস্থ শুভ্রবর্ণ ইন্দ্র পতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। —ভীষ্মপর্ব; ষোড়শ অধ্যায়

কুরু ও পাণ্ডব রজতময় রথে অবস্থিত হেমনির্মিত তালধ্বজ শোভিত ভীষ্মকে শ্বেতমেঘসমাজের শীতাংশুর ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

—ভীষ্মপর্ব; ষোড়শ অধ্যায়

শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিধিংশতি, শল্য, ভুরিশ্রবা ও বিকর্ণ এই সাত মহাধনুর্দ্ধর উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ ও রথে আরোহণ করিয়া অশ্বত্থামার অনুসরণক্রমে ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগের অত্যুন্নত সুবর্ণময় ধ্বজসকল রথসমূহ অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। —ভীষ্মপর্ব; সপ্তদশ অধ্যায়

কলিঙ্গরাজ ষষ্টিসহস্র রথ এবং যন্ত্র; তোমর তূণীর ও পাতকা পরিশোভিত পর্ব্বতসঙ্কাশ অযুত নাগ, পরকধ্বজ, শ্বেতচ্ছত্র, উরোভূষণ, চামর ও ব্যজনে শোভমান হইয়া গমন করিলেন।। —ভীষ্মপর্ব; সপ্তদশ অধ্যায়

মহানুভব পাঞ্চালনন্দন যজ্ঞসেন সক্ষৌহিনীসমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত পরাক্রান্ত বিরাটের সহবর্ত্তী হইলেন; তাঁহাদিগের রথে আদিত্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সুবর্ণভূষিত, নানা চিহ্নশালী ধ্বজসকল শোভা পাইতে লাগিল।।

—ভীষ্মপর্ব; ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জুনের রথে একমাত্র কপিধ্বজ কৌরব ও পাণ্ডবগণের অন্যান্য সমুদয় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া শোভমান হইল।। —ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

উৎকৃষ্ট গান ও পতাকাশোভিত আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত ধ্বজসকল সহসা সমীরণভরে বিকম্পিত হইলে বায়ুতাড়িত তালবনের ন্যায় সমুদয় জগৎ ঝন্ঝনায়মান হইয়া উঠিল। —ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

মহাবীর অর্জুন গাণ্ডীব ও বাণ হস্তে করিয়া গূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, অগ্নির ন্যায় শিখাশীল, শতকিঙ্কিনীশোভিত, সুর্বণমণ্ডিত, শ্বেততুরঙ্গযুক্ত, সুছত্র কপিধ্বজ ও কেশবা বিষ্টিত রথে আরোহণ করিলেন।। —একবিংশতিতম অধ্যায়

জয় গৈরিকধ্বজ জয় হিন্দুধ্বজ
ভারতবর্ষ পতাকা।
ভারতভাগ্যনভস্থলচুম্বি—
মনোহর হংসবলাকা।।

অগণিত-ভক্ত-হৃদয় অনুরাগে
রঞ্জিত অংকিত মণ্ডিত ত্যাগে
ভারত-মানস-কুমুদ-বিকাশন—
তৎপর নির্মল-রাকা।।

সংকট-লংকা-সমর-বিজেত্রী
রঘুপতি-কপি সেনাগণ নেত্রী
রাক্ষস সেনা-মথন রামরথ
চূড়া শোভি- পতাকা

শ্রীমদ্‌বাসুদেব রথশোভা
চঞ্চল-শ্রীগরুড়ধ্বজরূপা
অর্জ্জুন রথশীর্ষস্থ-কপিধ্বজ
রূপবিকাশি-পতাকা।।

হলদিঘাটরণ-কৃতদিগ্‌ দাহা
রুধির-সরোবর-কৃত অবগাহা
ভক্ত-প্রতাপ প্রতাপ বিবর্ধন
শত্রু-বিকম্পি-পতাকা।।

অস্তাচলগত ভারতসূর্য্যে
ভূষিত মণ্ডিত নবতর বীর্য্যে
রামদাস-শিবরাজকরোদ্ধৃত
গৈরিক কান্তি পতাকা।।

দীর্ণ তমিস্রা উদিত রবি আজি
সংহত হিন্দুকণ্ঠ ওঠে বাজি
জয় ভারতধ্বজ জয় হিন্দুধ্বজ
গৈরিক বর্ণ পতাকা।।